সপ্তপর্ণী

বিশ্বভারতী ছাত্রসম্মিলনী বার্ষিকী

ষষ্ঠ সংখ্যা : ১৯৬৩-৬৪

যুগ্ম সম্পাদক :

শ্রীঅনন্তকুমার জানা

শ্রীবলবীর সিং কঠ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীবিশ্বরূপ বসু
শ্রীকেনেথ উল্ড্রুফ
শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ
শ্রীপবিত্রকুমার রায়
শ্রীসোমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন দে
শ্রীরামকিঙ্কর

সম্পাদক মণ্ডলী :

শ্রীনকুল সিন্‌হা
শ্রীমতী রীতা ধর
শ্রীসিরাজুদ্দীন আমেদ
শ্রীমতী পুষ্প রাঠোর
শ্রীমতী শ্রীলা রায়
শ্রীঅঞ্জন শুক্ল
শ্রীসুবীর চৌধুরী
শ্রীআনন্দময় সেন
শ্রীসুশান্তকুমার সেন
শ্রীমোহিতকুমার পাণিগ্রাহী

সহায়তা করেছেন :

শ্রীগোপেশচন্দ্র সেন
শ্রীসুশীল রায়

মুদ্রক :

শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার

ব্রাহ্মমিশন প্রেস

২১১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :

শ্রীসুভাষ রায়

প্রকাশক :

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

সূচী

॥ প্রবন্ধ ॥

॥ কবিতা ॥

॥ গল্প ॥

শুভেচ্ছাবাণী—

ছাত্রসম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত "সপ্তপর্ণী"র ষষ্ঠবার্ষিক সংখ্যা পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করাতে পরম পরিতোষ অনুভব করছি। প্রবন্ধ গৌরবে এই সংখ্যাটি আগের সংখ্যাগুলির সুনাম বজায় রাখতে পেরেছে বলে মনে করি। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যবোধের বিকাশের কাজে 'সপ্তপর্ণী'র সাহায্য কম নয়। এই সব লেখক লেখিকারা অনাগতদিনে বাংলা সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন—এই কামনা করি।

পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শান্তিনিকেতন
২৮।২।৬৫

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সম্পাদকীয়

'সপ্তপর্ণী'র ষষ্ঠবার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রকাশে একটু দেরী হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।

এই সংখ্যাটিতে সুধীরঞ্জনদার শুভেচ্ছাবাণী পেয়ে আমরা খুব খুশী হয়েছি ও গর্ববোধ করছি।

পত্রিকাটিকে শোভন করার জন্য যে সকল অধ্যাপক আমাদের পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের এই স্নেহ ও উদারদৃষ্টিতে আমরা আনন্দিত।

বিশ্বভারতী প্রকাশনবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদের অনুরোধে পত্রিকা প্রকাশের জন্য মুদ্রনালয় ঠিক করে দিয়েছেন। তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী লেখা দিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন—তাঁদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাণীতীর্থের পথিকদের যাত্রাপথ আনন্দগানে মুখরিত হোক। তরুণদের সবসৃষ্টি যে শিল্পের যথার্থ মান পাবে এমন নয়—তবুও এগিয়ে যেতে হবে পরিপূর্ণ আদর্শনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়-পদক্ষেপে—এটাই আমাদের সাধনা, এটাই আমাদের লক্ষ্য। পথ চলতে চলতে হয়তো একদিন পাওয়া যাবে—'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার', তখন—

কেবল যাবে আঁধার কেটে আলোয় ভরবে গেহ
দৈন্য যে তার ধন্য হবে পুণ্য হবে দেহ,
পুলক-পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে।"

ইতি—

শান্তিনিকেতন
২২।৩।৬৫

বিনীত
সম্পাদকদ্বয়

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

সঙ্ঘমিত্রা সেন

রবীন্দ্রনাথের নিজের ছাত্রজীবন তাঁর কাছে প্রিয় ছিল না; তার প্রতি তিনি ছিলেন বীতরাগ। প্রায় সে সময় থেকেই ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর মনে এক নূতন আদর্শের সূচনা হয়। পরিণত বয়সে তাকে রূপ দেবার জন্য তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল একটি বিশেষ কর্তব্যবোধ। এই কর্তব্যবোধের মূলে ছিল তাদের প্রতি তাঁর অন্তরের সুগভীর অনুরাগ। এই অনুরাগ তাঁকে বসিয়েছে 'গুরুদেবে'র আসনে। আর এই 'গুরুদেব' পরিচয়টিই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

একটি আদর্শ বিদ্যালয় ও আদর্শ ছাত্রসমাজ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেন 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। এই সময়ে তাঁর মনে অঙ্কিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের চিত্র। তপোবনের যুগকে এ যুগে ফিরিয়ে আনা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর মতে "তখনকার কালে যে আদর্শ সক্রিয় ছিল তা সত্য, তা কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়"। প্রকৃতির কোলে থেকে ছাত্ররা পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠুক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। বদ্ধকুঠুরির মধ্যে বসে জ্ঞান-অর্জন সম্পূর্ণ হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেই তা হবে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ। কেননা, তাঁর মতে "প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে"। এর জন্য তিনি স্থাপন করতে চাইলেন ছাত্রদের জন্য একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র, যেখানে তারা নিজের বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করে চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করতে পারবে। খেলাধুলা, গানবাজনা, গ্রামের কাজ, ভ্রমণ ইত্যাদি সবকিছুকেই তিনি পূর্ণশিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁর এইসব আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রবর্তন হয় শান্তিনিকেতনে। ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে লাঠিখেলা, যুযুৎসু বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।

শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাই ছাত্রকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে তুলতে পারে না। তার জন্য চাই তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানের উদ্‌বোধন। শিক্ষার ক্ষেত্র বিদ্যালয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশেই প্রসারিত। ছাত্রদের কর্তব্যকে শুধু বিদ্যা-অর্জনের মধ্যে নিবদ্ধ রাখলে চলবে না, কর্মের ক্ষেত্রেও তার প্রসারণ চাই। দেশে যখন সংকীর্ণতা ও স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা দেখা দেবে, দেখা দেবে অভাব ও অগৌরব তখন ইতিহাসবিশ্রুত মহাপুরুষদের অনুসরণ করে, মৃত্যুকে স্বার্থকে গ্রাহ্য না করে এই ছাত্রদলকেই আত্মোৎসর্গ করতে হবে। এই কর্মের পথেই শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ছাত্রেরা যদি প্রত্যেক বস্তুকে "বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি" দিয়ে বিচার করে জানতে চায়, তবে সে জানাই হবে যথার্থ জানা। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সম্ভাষণ করে এ সম্পর্কে বলেছেন—

"তোমাদের দেশের সারস্বত বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি। দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রামপার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবে তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে।"

শিক্ষায় সর্বাঙ্গীণতা দানের জন্য তিনি তাদের দিয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। আত্মপরিচালনাকে তিনি শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ও আত্মসম্মান অনুশীলনের যথার্থ উপায় বলে মনে করতেন। স্বায়ত্তশাসননীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে "আশ্রম-সম্মিলনী" নামে একটি ছাত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়। এই সম্মিলনীর নানা বিভাগ। সাহিত্য-বিভাগের পক্ষ থেকে তারা মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা করে। এটি তাদের চিন্তাবিকাশের একটি প্রধান অবলম্বন। বিচারবিভাগে ছাত্ররাই হয় বিচারপতি। সেবাবিভাগের পক্ষ থেকে ছাত্ররা মাঝে মাঝে গ্রামে যায়, তথাকথিত নিম্নশ্রেণী ও দরিদ্রদের তারা সাহায্য করে। তার ফলেই সৃষ্টি হয় যথার্থ সহৃদয়তা। আসলে স্বদেশকে ভালভাবে জানা ও ভালবাসাকে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বচর্চার একটি প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছাত্র ও শিক্ষকরা একত্রে আশ্রমের কাজ পরিচালনা করবে। পরস্পরের প্রতি ও অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্যরক্ষাকে তিনি অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করতেন। ছাত্রদের প্রতিদিনের ব্যবহারে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা রক্ষা করা সমীচীন। প্রত্যেক দিন বৈতালিকে ও প্রতি বুধবারে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আপন নীতিবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাদের উচিত। পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য রক্ষা বিষয়েও তাদের সচেতন থাকা কর্তব্য। বেশভূষা সম্বন্ধে শৈথিল্যকে তিনি অপরের প্রতি অসম্মানকর কার্য বলে মনে করতেন। এইসব নির্দেশ ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, কলাবিদ্যা, সংগীত এবং নৃত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি মেয়েদের পূর্ণ সুযোগ দান করেন। মেয়েদের নৃত্যের প্রথম প্রচলন হয় এই আশ্রমেই। শ্রী ও সৌন্দর্যচর্চাকে তিনি মেয়েদের বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করতেন। কারণ, তাঁর মতে "যেখানে শ্রী নেই, সেখানে ধরে নিতে হবে নারী নেই"।

রবীন্দ্রনাথ সর্বদা ছাত্রদের প্রতি প্রত্যক্ষ উপদেশ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ, কর্মের মধ্য দিয়ে, আনন্দের মধ্য দিয়ে, সঙ্গীতনাটকের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষালাভ হয় জীবনগঠনের পক্ষে তারই উপযোগিতা বেশি। শুধু উপদেশ শুনে সে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনকালে ছাত্রদের জন্য তিনি যে গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও ছিল এই মহৎ জীবন গঠনের প্রেরণা।—

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু মিথ্যা বাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়।

জীবনগঠনের ক্ষেত্রে শুধু আনন্দ নয়, তার সঙ্গে পৌরুষ, নির্ভীকতা, দুঃসাধ্যসাধনের সংকল্প প্রভৃতি কঠিন বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনকেই তিনি স্থান দিতেন সকলের উপরে।

চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই,
চলো পদে পদে, সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে,...
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।

এই গানেও আছে ওই প্রেরণারই বাণী।

শুধু গান নয়, নানা নাটকের মধ্যেও পাই এই পথেরই নির্দেশ। 'শারদোৎসব' নাটকটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই নাটকের কেন্দ্রস্থিত বালক উপনন্দ ছাত্রদের সামনে একটি যথার্থ আদর্শরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বালকদের মুখে তিনি গান দিয়েছেন—

আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান,
দাঁড় ধরে আজ বস রে সবাই টান রে সবাই টান,...
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।

বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেন এই বাণীকে অবলম্বন করেই কর্মপথে অগ্রসর হতে পারে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তিনি যখনই কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, তখনই ছাত্রদের কল্যাণআদর্শকে রেখেছেন তার পুরোভাগে। তাঁর নীরবপ্রেরণার আর একটি ফল এই হয়েছে যে, এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ ও দেশভেদের উর্ধ্বে একটি মহৎ বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ। তাই তো এখানকার ছাত্ররা এককণ্ঠে গাইতে পারে—

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে যে সব হতে আপন।…
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইএর সঙ্গে ভাইকে
সে যে করেছে একমন॥

তারুণ্যের পূজারী সুভাষচন্দ্র

শৈলজাকান্ত মজুমদার

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, ১৯৩৯ সালের মে মাসের কোন এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। ছোট্ট এই অর্থে, যে, উপস্থিত শোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল স্বল্প—কারণ, আশ্রমের তখনও বাল্যাবস্থা। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার গভীরতাকে যদি কোন অনুষ্ঠানের বিরাটত্বের মানদণ্ড ধরা যায়, তবে সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের তুলনা মেলা ভার। সেদিনকার সেই ছোট্ট সভাটিতে বাংলা-দেশের দুই জ্যোতিষ্কের সমাবেশ ঘটেছিল—সভাপতির আসনে ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, এবং অতিথি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। বাংলাদেশের হয়ে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করে কবি সেদিন বলেছিলেন—"সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন,—সুকৃতের রক্ষা এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।...... ...বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙ্গালীসমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা-দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।"

সুভাষচন্দ্র তখনও নেতাজী হন নি, স্বাধীনতাসংগ্রামের অসংখ্য যোদ্ধাদের অন্যতম মাত্র। কিন্তু, সত্যদ্রষ্টা মহাকবির ধ্যান-দৃষ্টিতে সুভাষের আসলরূপ সেইদিনই ধরা পড়েছিল। তাই অগণ্য নেতার মধ্য থেকে সেদিন তিনি সুভাষকেই মহানায়করূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। আর সেইজন্যই কবি অমন করে গীতার অধিনায়কের পাশাপাশি সুভাষকে অবলীলায় বসাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়—কবির স্বচ্ছদৃষ্টিতে সুভাষের চারিত্রশক্তির মূলসূত্রটিও ধরা পড়েছিল। তিনি বললেন—"বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি।...তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সঙ্কটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে।" —এই অপরাজেয় তারুণ্যশক্তিই সুভাষচরিত্রের মৌল

উপাদান। এই তারুণ্যধর্মের প্রভাবেই সুভাষচন্দ্র বারে বারে সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে নূতনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে তিনজন গুরুর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আর স্বামী বিবেকানন্দ। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ গুরু। লাহোর কংগ্রেসে সুভাষের বৈপ্লবিক ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে সময়ে ট্রিবিউন পত্রিকা লিখেছিলেন,—'সুভাষচন্দ্র সি, আর, দাসের ভাবরূপ। যেখানে অনাচার, বিভীষিকা, সেখানেই দেখা যায় সুভাষের যোদ্ধৃরূপ। জাতীয় গৌরব অর্জনের যুদ্ধে সর্বদাই তিনি অগ্রণী।' সুভাষচন্দ্রের চিন্তাক্ষেত্রে গুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। যখনি দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, দুর্যোগ হয়ে এসেছে আসন্ন তখনই এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাছে ছুটে এসেছেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর কল্যাণ আশিশের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ভবিষ্যতের পাথেয়। সুভাষচন্দ্রের লেখায়, বক্তৃতায়, তাঁর চিঠিপত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এই মহানায়ককে। আর দেশপ্রেমে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক অখণ্ড ভারতীয়তা বোধে সুভাষের গুরু ছিলেন বিবেকানন্দ। খুব ছোটবেলা থেকেই সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন, বিবেকানন্দের মত ও পথ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আত্মচরিতে, মায়ের কাছে চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন। পাপের পথে, নরকের পথে গেলে যদি বুঝি দেশের কল্যাণ হয়, তাতেও পেছপা হব না—স্বামীজীর এই কথা সুভাষেরও ছিল জীবনাদর্শ।

স্বামীজী এবং নেতাজী—গুরু এবং শিষ্য, বাংলার যৌবনশক্তির দুই মূর্ত প্রতীক। পুরাতনের পূতিগন্ধময় আবর্জনা সরিয়ে তার জায়গায় নতুনের ফসল ফলানো, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করবার দুর্জয় সংকল্প যদি যৌবনের ধর্ম হয়, তবে দুজনের জীবনেই যৌবনের এই রূপ যে পূর্ণভাবে মূর্ত হয়েছে, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। দু'জনেই তরুণ এবং যুবসম্প্রদায়কে একটা মহৎ আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

বাংলাদেশের নবযুগের প্রারম্ভিককালে তরুণদের পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বেদান্তের সত্য প্রচারের দ্বারা রামমোহন সমাজের অধর্ম এবং কুসংস্কারকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীযুগে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ নতুন বাণীর দ্বারা তরুণের মনে একটা নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। এই সময় থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রকটিত হয়ে আসছিল। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা বলিষ্ঠরূপ পেল স্বামীজীর কণ্ঠে—"Freedom, freedom is the song of the soul"

স্বামীজীর এই বাণী যুবশক্তিকে সেদিন উন্মত্ত করে তুলেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা স্পষ্টরূপ লাভ করলো অরবিন্দের ঘোষণায়—"We want complete autonomy free from British control।" স্বাধীনতার প্রেরণা পেয়ে তরুণ বাঙ্গালী সেদিন ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করে বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে ছুটে এসেছিল। বিপ্লবের পথ ভুল হোক, আর ঠিকই হোক, তার অন্তরের প্রচণ্ড শক্তিকে তো উপেক্ষা করা যায় না। স্বয়ং, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"…পরবর্তীকালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো দগ্ধ করলো নিজেদের, পথকে করে দিল বিপদ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি।……ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা গিয়েছিল, তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে?" একথা আজ পরিষ্কারভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শুধু কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা আনে নি, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকাশ ও পরিণতিতে বিপ্লববাদের স্বাক্ষর ও স্পষ্ট এবং গণনীয়। বাংলার এই বৈপ্লবিক চেতনারই সৃষ্টি সুভাষচন্দ্র। বৈপ্লবিক অরবিন্দের যথার্থ উত্তরসাধক তিনি।

১৯২৯-৩০ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও যুবসম্মেলনে সভাপতি হয়ে ভারতবর্ষের ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় তরুণ আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপটি বিশ্লেষণ করেন। যুগে যুগে দেশে দেশে এই তরুণেরাই পুরাতনের অচলায়তনকে ধ্বংস করেছে, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটিয়েছে; নতুন সভ্যতার পত্তন করেছে। তারুণ্য কোন বিশেষ একটি বয়সের ধর্ম নয়, তারুণ্য একটি শক্তি। যে মানুষের মধ্যে বিকাশ ঘটবে এই শক্তির, সে-ই তরুণ, তার বয়স যা-ই হোক না কেন। সুভাষচন্দ্রের কথায়—"ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়াদর্শনে ভীত হয় না; অথবা নবসৃষ্টিরূপ কার্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে, আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা"।

সুভাষচন্দ্র নিজে যেমন ছিলেন এই তারুণ্য শক্তির মূর্তপ্রতীক, তেমনি সমগ্র দেশে এই তারুণ্যশক্তির উদ্বোধন করে তরুণদের সামনে জলন্ত আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। তরুণের আদর্শ কি এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—"তরুণের আদর্শ বর্তমানের সকলপ্রকার বন্ধন,

অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও জাতি সৃষ্টি করা।" একদিন তরুণদের ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

সুভাষচন্দ্রও ঠিক একই আহ্বান জানালেন। স্বাধীন চিন্তা এবং নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈবকে পরিহার করে, পুরাতনের সমস্ত বাধা নিষেধকে ধ্বংস করতে হবে। তরুণের অগ্রগতির জয়রথ যে অবরোধ করবে, সে যে-ই হোক না কেন, সমূলে ধ্বংস করতে হবে তাকে। ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাই বলে পরম-বিজ্ঞের মত ভালোমন্দ বিচার করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তিনি বললেন—We have the right to make mistake। উত্থান পতনের তরঙ্গ বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই তিনি তরুণদলকে ডাক দিলেন সিদ্ধির পথে।

একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাই সুভাষচন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তরুণ আন্দোলনের বিভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে চরিত্রসৃষ্টি করা। বিবেকানন্দ বলতেন—Man making is my mission—সুভাষের আদর্শও তাই। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার্জনই তরুণদলের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের কথায়—"অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হইতে পারে না, অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থপাঠ, ও কতকগুলি পরীক্ষাপাশ। ইহারদ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে, হয় তো বড় চাকুরী পাইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না।"

তরুণদলের আর একটি প্রথম কাজ তাদের নিজেদের অধিকার অর্জন করা। আমাদের দেশে নবীনদের প্রাচীনের দল চিরকালই স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। নবীনদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা তো হয়ই না, উপরন্তু নাবালক বলে তাদের সর্ববিষয়ে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। যে সমাদরও শ্রদ্ধা লাভ করে তরুণের দায়িত্ববোধ ফুটে

ওঠে, কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয়, আমাদের দেশে তার নিতান্ত অভাব। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—আমাদের ছাত্রেরা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র, বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবলকের তুল্য এবং পুলিশ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র।" সেদিনকার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে সত্য, কিন্তু এতদিন পর আজও একথা আমাদের ছাত্রদলের পক্ষে সমান ভাবেই প্রযোজ্য।

তরুণদলের একটি বিশেষ কর্তব্যের প্রতিও সুভাষচন্দ্র অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। সেটি হচ্ছে—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান্ আদর্শ রক্ষা করার ভার তরুণদেরই উপর। পৃথিবীতে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে তরুণদলকেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রবীনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে নবীনকে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—"তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে, যে কূটরাজনীতিবিৎদের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মত। কামাণ বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্মবলিদান করিতে হইবে—অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয়, যা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না।...যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়—তবে বিশ্বের তরুণসমাজই তাহার স্থাপনা করিবে।"

সুভাষচন্দ্র একটি ব্যাপারে তরুণদলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সৎউদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যদি ভুলভ্রান্তি হয় তো হোক, কিন্তু আদর্শ টাই যেন ভ্রান্ত না হয়। আদর্শকে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করে, অন্যায় আচরণ করা বা অন্যায় আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। গুণ্ডামির দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। দলীয় মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে, তিক্ত ও বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে গুণ্ডামিকে আশ্রয় করে জনসাধারণের সহানুভূতি ও ভালবাসা হারানো চলবে না।

সুভাষচন্দ্র যে তারুণ্য শক্তির কথা বলেছেন, তিনি নিজে ছিলেন তার একটা বিরাট আধার। ছোটবেলা থেকেই তিনি তরুণদলের নেতা। ছাত্রদলের নেতা হয়ে তিনি মহামারীতে সেবাকার্য চালিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতির সংগঠন করেছেন, আবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যও পরিচালনা করেছেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তিনি যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন, তা তাঁর সাংগঠনিক শক্তিরই পরিচয় দেয়। এই কলকাতা কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র, মহাত্মাগান্ধী, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি ভারতের রাজনৈতিক দিকপালদের বিরোধিতা করে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের দাবী জানালেন। সেদিন

তিনি ভোটে পরাজিত হলেও সমস্ত দেশবাসী তাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে ও শ্রদ্ধায় এই বিদ্রোহী তরুণের কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন দেশ বুঝতে পেরেছিল, অন্ততঃ একজনও আছে যে আপোষহীন সংগ্রামের শক্তি ধারণ করে। সুভাষের এই অপরাজেয় তারুণ্যশক্তির বিদ্রোহের ফলেই পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, আবার সেই একই তারুণ্য শক্তির বলে তিনি প্রবাসী ভারতীয় তরুণদলকে একত্রিত করে 'আজাদহিন্দ্‌ ফৌজ' গঠন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সমস্ত জীবনটাই একটা সদাচঞ্চল, সংগঠনধর্মী তারুণ্যশক্তির প্রকাশ, জীবনের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত কোথাও তার এতটুকু হ্রাস নেই।

একদিন তরুণ আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র সারা দেশকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেদিন তরুণসমাজের এই আদর্শনেতার চিন্তাধারা ও পথনির্দেশ ভারতের যুবআন্দোলনের প্রসার ও অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। আজকের দিনেও ছাত্র ও যুবআন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বাণী, নির্দেশ এবং মতামত আলোচনা করে তরুণের চলার পথ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

* প্রবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১। কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ।

২। তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র।

৩। নূতনের সন্ধান—সুভাষচন্দ্র।

৪। নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।

৫। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ স্বরূপ—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়। 'দেশ' পত্রিকা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩।

৬। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায় ও শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার দৃষ্টিতে ভুলুদা (শুভময় ঘোষ)

পূর্নিমা ঘোষ

খুব ছোটবেলায় এসেছিলাম শান্তিনিকেতনে, আজ প্রায় দেখতে দেখতে ষোল সতের বছর কেটেও গেল,—কিন্তু কি পেলাম, কি দিলাম—এ প্রশ্ন মনে জাগতেই কেমন যেন ইচ্ছা করে বিগত দিনের মানুষগুলির কথা ভাবতে। কি দিলাম?-এ প্রশ্নটা খুবই নগণ্য হয়ে ওঠে যখন দেখি 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।' কত বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও গুরুজনদের কাছ থেকে আজও তো অনেক কিছু পাচ্ছি, কিন্তু ভুলুদা অর্থাৎ শুভময়-(ঘোষ) দার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাঁর আসন কোথায়? ওঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা কি শুধু আমার জীবনেই অক্ষয় হয়ে আছে? সমস্ত আশ্রমবাসীই কি তাঁর কাছে ঋণী নন? যাক্, আমার জীবনকে তিনি যে কতখানি প্রভাবিত করেছেন, তা লেখার দৈন্যতায় প্রকাশ করতে না পারলেও, আমি জানি জীবনের অক্ষয় স্মৃতি ভাণ্ডারে তিনি সযত্নে রক্ষিত আছেন। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো আমার, অমূল্য অক্ষয় হয়ে উঠেছে তনয়দা, তেজেসদা প্রভৃতি গুরুজনদের সংস্পর্শে, এঁদের সঙ্গে আজ ভুলুদাকেও আমার সেই উচ্চস্থানটিতে স্থাপন করলাম।

তাঁকে সকলেই নিশ্চয় জানেন, অন্তত না চিনলেও, তাঁর পরিচয়টুকু শুনে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্ধু বান্ধবও তাঁর কথা কাগজে লিখেছেন কাজেই পৃথক ভাবে সেগুলোকেই আর লিখতে চাই না, শুধু 'আমার দৃষ্টিতে ভুলুদা'—এ সম্বন্ধেই কিছু লিখতে চাই। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁকে প্রতিটি আশ্রমবাসী আজও অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব ছোটবেলা থেকে, কারণ তাঁকে পেয়েছিলাম নিজের দাদা হিসাবেই, কখনো মনে পড়ে না কোনদিনের জন্য তাঁকে 'পর' বলে মনে করেছি। তাই আজ ভুলুদার কথা লিখতে বসে কত স্মৃতি আমার মনের দরজায় এসে উঁকিঝুকি মারছে।

মনে পড়ছে আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন তিনি আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন; পরণে তাঁর ধুতি ও পাঞ্জাবী, কাঁধে থাকত ঝোলান ব্যাগ, আর মাথায় বেতের টোকার সঙ্গে থাকত মুখে মৃদুহাসির আমেজ। তাঁর সে কাঁধের থলি পূর্ণ থাকত কখনো বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থতে, আবার কখনো বা নিজের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের সঙ্গে থাকত লজেন্স, টফির ঠোঙ্গা—এর থেকে ভাগ বসাতে দ্বিধামাত্র করতাম না, কিন্তু ভুলুদার ঐ শান্ত মুখশ্রীখানা দেখে আমার কেমন যেন মনে হত উনি খুব পড়াশোনা করেন, আর স্বরচিত কবিতা লেখেন তাই একদিন সুযোগ বুঝে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আপনি বুঝি নিজে কবিতা লেখেন? তাই সবসময় লেখার সরঞ্জাম সঙ্গে রাখেন, না?'

এর উত্তরে তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—'দূর কবিতা লিখতে পারিনা, তবে পড়তে খুব ভালবাসি, এই দেখ না থলি ভর্তি রবীন্দ্রনাথের বই।' সত্যি দেখলাম-সঞ্চয়িতা ও অন্যান্য কতগুলো কবিতার বই থলিতে আছে। তবে তিনি যে 'কবিতা লিখতে জানিনা' বলে সেদিন নিতান্তই বিনয় প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা বুঝেছি অনেক পরে, কারণ বন্ধুদের কাছে চিঠির ভাষাই আজ তার সাক্ষ্য বহন করছে। ভুলুদা ও তাঁর দাদা মণ্টুদা মাঝে মাঝে যখন আমাদের বাড়ীতে আসতেন তখন গল্পের মজলিস এমন ভাবে জমে উঠত যে, তাঁদের বাড়ী ফেরার সময় হলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে পড়ে গুরুপল্লীতে থাকতে—সেই বাড়ীর বারান্দাটা হত আমাদের ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার মাঠ, প্রায়ই সেই বারান্দায় আমিও, আমার ভাই এবং পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতাম—মাঝে মাঝে ভুলুদা ও মণ্টুদা (তাঁর দাদা) হঠাৎ এসে আমাদের মতন কতকগুলি শিশুর সঙ্গে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতে শুরু করে দিতেন, বারান্দার মধ্যেই চলত উভয় পক্ষের তীব্র আক্রমনাত্মক খেলা,—ভুলদা, মণ্টুদাও মেতে যেতেন সে খেলায়। এখন মনে পড়ে কত আনন্দে সে সব দিনগুলো কেটেছে; আর সেদিন ফিরে আসবে না, মণ্টুদাকে সঙ্গী হিসাবে আজ যদিও বা পাই, ভুলুদাকে আর কোনদিন পাব না। শিশুকাল কাটিয়ে যখন বেশ বড় হয়েছি, তখনো যদি কখনো ভুলুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে অমনি তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন—'কিরে ক্রিকেট, ফুটবল খেলছিস না? খবরদার এ খেলাগুলো ছাড়িস না, তোকে দেখতে চাই বড়দের সঙ্গেও ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ খেলছিস, বুঝলি?' তখন লজ্জা পেয়ে বলতাম 'দূর ওরা এখন বাড়ীর বারান্দায় আর খেলে না, সবাই খেলার মাঠে খেলে।' হেসে বলতেন—'তুইও ওখানে ওদের সঙ্গে খেলবি, খেলায় আবার লজ্জার কি আছে? জানিস খেলাধূলায় বিদেশী মেয়েরা ভারতীয় মেয়েদের চেয়ে কত এগিয়ে আছে?'—তাঁর সে উৎসাহ দেবার মুখে আর কোন প্রতিবাদই করতে পারতাম না। সর্বদা বাড়ীতে এসে দেখা করতে পারতেন না বলে, রাস্তায় দেখা হলেই বাড়ীর সকলের খবরাখবর নিতেন।

মনে আছে একদিন সন্ধ্যায় মা তাঁকে একটা গান শোনাতে বললে পর তিনি কোনরকম আপত্তি বা দ্বিধা না করে একটি গান শুনিয়েছিলেন। তাঁর সেই দরদী গলায় গাওয়া—'তোমার খোলা হাওয়া, লাগিয়ে পালে' গানটি আজও আমি যেন শুনতে পাই, সেদিনের গাওয়া এই গানটি আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, আজও আমার মনে আছে তিনি বারান্দার কোন স্থানটিতে কি ভাবে বসে গেয়েছিলেন। সে আজ কতদিনের কথা—কিন্তু তবুও সে ছবি এতটুকু ম্লান হয়নি।

আজ টুকরো টুকরো কত স্মৃতিই মনে পড়ছে,—একদিন খেলার মাঠ থেকে সন্ধ্যার

বাড়ী ফিরছি এমন সময় গেট থেকেই শুনতে পেলাম, কে যেন অপূর্ব কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে

ময়ূরের মত নাচেরে হৃদয় নাচেরে……।'

বুঝতে পারিনি কে পড়ছেন, ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি কবিতাটি একাগ্র চিত্তে পড়ে চলেছেন। আর আমার দিদি তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে নেচে চলেছে। মাঝে মাঝে আবার দিদির নাচের তাল কেটে গেলে, ভুলুদা থেমে গিয়ে সেই জায়গাটা পড়ে, তার তাললয় দিদিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দুজনের মহড়া চলার পর তিনি চলে গেলেন। তখন দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি ব্যাপার—কবিতার সঙ্গে নাচবে বুঝি?'—মনে আছে দিদি পাংশু মুখ করে বলেছিল—'খুব ভয় করছে রে, উনি এত ভাল আবৃত্তি করছেন, আর এটার জন্য এত খাটছেন যে, নাচটা ভাল না হলে লজ্জায় ভুলুদাকে মুখ দেখাতে পারবনা।'

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই দেখেছিলাম লাইব্রেরীর বারান্দায় একটা উৎসবে ভুলুদার সেই অপূর্ব্ব উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তিটির সঙ্গে দিদিকে নাচতে ও তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করতে। কিন্তু সেই নাচের শেষে দেখেছিলাম, ভুলুদা ছুটে এসে দিদিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই সময় তাঁর মুখে ছিল সাফল্য লাভের গর্ব, অথচ এ গর্ব যে তাঁরই পূর্ণ-প্রাপ্য সেটা স্বীকার না করে তিনি দিদিকে বলেছিলেন—'তোর নাচটার তুলনা হয়নারে। আর আজকে, আমরা যারা সেদিন তাঁর আবৃত্তি শুনেছিলাম, তারা বলব—'তাঁর আবৃত্তির তুলনা হয় না।'

এরপর তাঁকে আমি দেখেছি 'ডাকঘর নাটকে'র মধ্যে অন্য রূপে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনের খাতিরে সঙ্গীতভবনে যেতাম 'ডাকঘরের' মহড়া দেখতে। সেখানেও সেই মহড়ায় দেখেছি তাঁর একাগ্র সাধনা! তিনি হয়েছিলেন দই ওয়ালা। এ পাটটি খুবই ছোট—কিন্তু 'দই,-দই—ভাল দই'—এই ডাকের মধ্যেই দেখেছিলাম তাঁর সমস্ত হৃদয়ের মাধুর্য্যকে ঢেলে দেবার একাগ্র সাধনাকেও চেষ্টাকে। আমার বেশ মনে আছে যে, নাটকের সেই ডাকটুকুই সকলের মনকে অভিহিত করে দিত। এতটুকু অভিনয়ের মধ্যেই তিনি সকলের মনকে জয় করেছিলেন ও নিজ প্রতিভাকে তুলে ধরেছিলেন।

শুধু বাড়ীর মধ্যে নয়, অভিনয়ে নয়, তাঁকে দেখেছি আশ্রমের পরিবেশে,—খেলার মাঠে উৎসাহী দর্শক হিসাবে, গল্পের আসরে প্রধান ভূমিকার আসনে। কখনো বা তাঁকে দেখেছি আশ্রমের পথে ঘাটে গানের ফোয়ারা ছোটাতে, কখনো বা ভুলুদাকে পিকনিকে দেখেছি হাসি ও গানের খোরাক জোটাতে।

খেলাধূলাতে তিনি যে খুব নামজাদা কেউ ছিলেন তা হয়ত নয়, তবে ক্রিকেট ম্যাচে

তাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যেত। আবার কখনো বা সখ করে ব্যাড্মিণ্টন খেলতেও তাঁকে দেখা যেত। কিন্তু তাই বলে তাঁর অন্যান্য খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল না—এ কথা যেন মনে না করি! কারণ আজকের দিনে অনেকেই যাঁরা খেলাধুলাকে ভালবাসেন ও নিজেরা খেলেন, তাঁদের চেয়ে-তাঁর উৎসাহও কোন অংশে কম ছিল না। শুনেছি, ক্রিকেট খেলা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে—তাঁর সময় একবার নাকি এখানে ছাত্রদের দলের সঙ্গে ষ্টাফদের দলের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল। এই সময় ভুলুদা ও তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধু বিশ্বজিৎদা—এরা দুজনেই এখানকার ষ্টাফ ছিলেন। তার ওপর আবার বিশ্বজিৎদা এই খেলার অধিনায়ক ছিলেন। কাজেই বিশ্বজিৎদার উপর ভার পড়ল ক্রিকেট ম্যাচের টিম সিলেক্ট করবার। বিশ্বজিৎদা পড়লেন খুব মুস্কিলে, কারণ সেসময় অনেক স্টাফ প্লেয়ার ছিলেন যাঁরা ভুলুদার থেকে ভাল খেলেন। কাজেই ভুলুদাকে প্রথম এগারোজন প্লেয়ারদের মধ্যে নিলে অন্যরা কোনরকম দোষারোপ করতে পারেন-এই কথা মনে করে তিনি ভুলুদাকে Team থেকে বাদ দিতে বাধ্য হলেন, অথচ ভুলুদার খেলার খুব সখ এবং এ খেলাটায় চান্স পাবেন বলে রোজ প্র্যাক্টিসেও এসেছেন। এক্ষেত্রে কি করা যায় ভাবছেন, এমনসময় খেলার পূর্বরাত্রে (মঙ্গলবার) ভুলুদা, বিশ্বজিৎদাকে বলে গেলেন—'আমি তো কালকে খেলছিই, কটার সময় মাঠে আসবরে?'—বিশ্বজিৎদা কোনরকমে ঢোকগিলে তাঁকে বললেন 'দশটা', আর মনে মনে ঠিক করলেন—পরের দিন মাঠেই তাঁকে বলে দেবেন 'তুই টুয়েলভ্ ম্যান'। এদিকে যথাসময়ে ভুলুদা ধোপদুরস্তর খেলার পোষাক পরে মাঠে এসে হাজির হলেন এবং এসেই দেখলেন স্টাফরা প্রথমে ব্যাটিং পেয়েছে। উনি নিজে বেশ বুঝতে পেরেছেন আজকের খেলায় চান্স পাবার যোগ্য নন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর কেমন ইচ্ছা করল বিশ্বজিৎদাকে নিয়ে একটু মজা করতে। এদিকে তাঁকে আসতে দেখেই বিশ্বজিৎদা একেতাকে ঠেলাঠেলি করছেন—ভুলুদাকে বলে দিতে যে 'তিনি টুয়েলভ ম্যান', কিন্তু কেউ গিয়ে বলতে রাজি হচ্ছেন না। ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎদা কিছু বলবার আগেই ভুলুদা প্যাড ও হাতে গ্লাবস্ লাগিয়ে একটা ক্রিকেট ব্যাট্ হাতে নিয়ে অতলোকের মাঝখানে এসে বলে বসলেন—'বিশ্বজিৎ আমাকে কত ডাউনে নাবিয়েছিস্ রে? আমি কিন্তু প্রথমেই নাবছি।'—এই বলে তিনি মাঠে ঢুকবার আগে scorer কে চিৎকার করে বলে দিলেন 'আমি নাবছি।' বিশ্বজিৎদা তো একবারে বোকা বনে গেলেন, অতলোকের মাঝখানে তাঁকে না পারলেন নিষেধ করতে, না পারলেন গিয়ে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ফেরাবার আর দরকার নাকি হয়নি, কারণ একটু পরেই তিনি গোল্লারাণ করে, প্রথম বলেই আউট্ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। গোল্লারাণ করার পরও ভুলুদার মুখে হাসি দেখে বিশ্বজিৎদা রেগে গিয়ে বলেই ফেললেন—'তুই নেবে গেলি কেন

বলত ? এদিকে আজকে ছাত্রদলের সঙ্গে বাজি ফেলেছি জিতব বলে, একটাও তো রাণও করলি না, এখন কি করি বলত ? আমি তো তোর নাম টুয়েলভ্‌ ম্যানের জায়গায় রেখেছি, তুই আমাকেও খেলতে দিলি না, নিজেও রাণ করলি না।' ভুলুদা হেসে নাকি বলেছিলেন—'আমি জানতাম তুই আমাকে কিছুতেই বলতে পারবি না যে, আমি ম্যাচে চান্স পাইনি, তাই একটু মজা করেই তোকে খেলতে দিলাম না। তোরা তো বড়ো খেলয়াড়, সব খেলাতেই চান্স পাবি, এই ক্ষুদে ম্যাচে না খেললে কিছু এসে যাবে না।' এই বলেই পাশে এসে বসে পড়েছিলেন। এদিকে ব্যাটিং মিস্‌ করে বিশ্বজিৎদা ঠিক করলেন ফিল্ডিং এর সময়, তাঁকে দিয়েই রোদের মধ্যে ফিল্ডিং করাবেন। ফিল্ডিং এর সময় এলে ভুলুদাকে ফিল্ডিং দিতে বললে পর, ভুলুদা বলেছিলেন—'আরে আমাকে তো তুই টুয়েলভ ম্যান বললি, আমি কেন যাব ? তুই তো এগারো জনের মধ্যে ছিলি, তুই বরং যা।' সেই সময় বিশ্বজিৎদার রাগান্বিত মুখখানা দেখেই ভুলুদা হেসে বললেন—'রাগ করছিস কেন ?' এই কথা বলেই হাসতে হাসতে মাঠে ঢুকে ফিল্ডিং দিতে লাগলেন। উনি ব্যাটিং এর চেয়ে ফিল্ডিং ভাল দিতে পারতেন বলে, সেদিনও খুব ভাল ফিল্ডিং দিয়ে বিশ্বজিৎদার রাগকে দুর করেছিলেন এবং খেলা শেষে দেখা গেল দুই বন্ধুর মধ্যে মান-অভিমান বা রাগের কোন চিহ্নই নেই, বরং নিজেদের এই রসিকথায় প্রাণখুলে দুজনেই হাসছেন। এটা যে শুধুমাত্র গল্প, তা নয়; এর মধ্যেই আমরা সদাহাস্যময় ভুলুদার সরলমনটাকে খুঁজে পাই। কতখানি বন্ধুপ্রীতি থাকলে পরে এতখানি সাহসের কাজ করতে পারে তার প্রমাণ ভুলুদাই রেখে গেছেন। ছোটবড়, বন্ধু বান্ধব সকলকে ভালবাসার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে।

কত সময় আশ্রমের পথে চলতে চলতে হাসির শব্দে চমকে উঠেছি, পিছনে ফিরে দেখেছি ভুলুদা, অমিতদা ও বিশ্বজিৎদা প্রাণখুলে হাসছেন। কখনও বা পথ চলতে চলতে শুনেছি তাঁর সুমধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান, কখনো বা পূর্ণিমার রাত্রে শালবিথীতে ঘুরলে শোনা যেত বাড়ী ফেরার পথে তিনি গেয়ে চলেছেন—'ও আমার চাঁদের আলো'। আবার কখনো বা তাঁকে দেখতাম, পাশের বাড়ীতে বন্ধু মন্টু রায়দার কাছে আসবার সময় গাইছেন— 'নারে, নারে, ভয় করব না

বিদায় বেদনারে, আপন সুধা দিয়ে—

ভরে দেব তারে।'

সত্যিই আজ মনে হচ্ছে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখের সেই মৃদু হাসিখানাই জানিয়ে দিয়ে গেছে বিদায়ের শেষ মুহূর্তে তিনি ভয় পাননি, কারণ শুধু বিদায়কেই আপন সুধা দিয়ে ভরিয়ে যাননি, সমস্ত আশ্রমকেই তো তিনি ভরে দিয়ে গেছেন তাঁর আপনসুধা দিয়ে।

মৃত্যুর করালমূর্তি যাঁকে ভীত করেনি, সেই আশ্চর্য প্রতিভাবান মানুষটির আকস্মিক মৃত্যু এসে আমাদের সকলকে মৃত্যুর বিভিষীকারকথা জানিয়ে দিয়ে গেছে।

আশ্রমের আকাশে বাতাসে তাঁর সেই গানের সুর, তাঁর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। তাই আজও পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই সেই গানের সুর, সেইগলার স্বর' সেই প্রাণখোলা হাসির শব্দ। মনে হয় আশ্রমের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে মিশে আছে তাঁর স্নেহ, তাঁর ভালবাসা, একথায় তাঁর আত্মাই আশ্রমের আত্মা, আবার এই আশ্রমের আত্মাই হল তাঁর আত্মা। উৎসব মুখর দিনগুলোও যেন মনে পড়িয়ে দেয় 'সেনেই', কারণ এই তো সেদিনে একটা সভায় (১৫ই অগষ্ট, ১৯৬৭) শুনিয়ে গেলেন তাঁর শেষ অপূর্ব কণ্ঠস্বরকে—

'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে,
দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল ক্ষমা কর সবে বলে গেল ভালবাস।'···

এরপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় অসুস্থ হবার দু'দিন আগে। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনেও অনেক ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে ছোটবেলার থেকে একটানা পড়াশুনা করে একেবারে M. A. পাশ পর্যন্ত করলেন। পাশ করবার পর ঠিক করেছিলেন এখানেই চাকরী করবেন। সবসময় বলতেন আশ্রম আমাকে এত কিছু দিল, এবার আমার ঋণ শুধবার পালা।' এখানে তাঁর একটা চাকরীও হল— বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁর দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ শুনলাম চাকরীতে কিসের গণ্ডগোল হওয়ায় ভুলুদা চাকরী ছেড়ে দিয়ে মস্কোতে চলে যাচ্ছেন, সেখানেই নাকি চাকরী করবেন। সংবাদটা শুনে অবধি মন খারাপ হল কিন্তু আনন্দ হল যখন শুনলাম মস্কোর চাকরী অনেক ভাল চাকরী। যাবার সময় আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে এলেন স্ত্রী সুপ্রিয়াদিকে নিয়ে। আমাদের সকলের চোখ প্রায় ছল ছল করে উঠল— দেখলাম ভুলুদার মুখেও সেই উজ্জ্বল হাসিটি নেই, শুধু যাবার পূর্বে মাকে বলে গেলেন— 'বৌদি জীবনেও ভাবিনি এমনি করে আশ্রমকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।'—কিন্তু মস্কোতে গিয়েও তিনি একমুহূর্তের জন্য আশ্রমকে ভুলতে পারেননি—সর্বদা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চিঠির মাধ্যমে খোঁজ খবরনিতেন। তাঁর সেই চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায় আশ্রমের প্রতি তাঁর সে ভালবাসা কতখানি গভীর ছিল।

মস্কোতে যাবারপর তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বেশ কয়েকবার ঘুরেও গেছেন। বিশ্বজিৎদাকেও মস্কোতে পাকড়াও করে নিয়ে গেছেন। দুই বন্ধুতে সপরিবারে সেখানেও জমিয়ে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎদা একবার মস্কো থেকে শান্তিনিকেতনে এলেন, রাস্তায় একদিন দেখা হলে পরে বললেন—"দেশে' তোর জীবনী পড়ে খুব খুশী হয়েছি,

কিন্তু তোকে আমার অভিনন্দন জানাবার আগে, ভুলু বলেছে ওর অভিনন্দনটা জানাতে—তানা হলে ভীষণ চটবে। তুই তো আর জানিস না ওটা দেখে মস্কোতে ভুলু কি কাণ্ডটাই না করেছে।' ব্যাপারটা শেষে বিশ্বজিৎদাই বললেন—"আমাকে তো হঠাৎ রাত্রে বেলা ভুলু Phone করলো—'শিগ্‌গির পারলে একবার আমার বাড়ী চলে আয়, খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে।' আমি যত বলি-'বল না কি ব্যাপার?' ও ততো বলে 'আ: আয় না একবার, তাহলেই দেখতে পাবি।'—ওর গলার আনন্দোচ্ছ্বাস শুনেই বুঝতে পারলাম সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমার কাজ আছে তাই তখন যাওয়া সম্ভব নয়—এ কথা যখন ওকে জানালাম, তখন ও উচ্ছ্বসিত গলাতেই Phoneএ বলে উঠল—'আজকের 'দেশ'টা দেখেছিস? না দেখলে সাংঘাতিক একটা ছবি মিস্ করবি। আমি আর সুপ্রিয়া এটাকে নিয়ে খুব Hot discussion করছি।' আমি কত বললাম 'বল না কার ছবি?'—অমনি উত্তর দিল 'সারারাত ধরে তুই ভাব।' বুঝতেই পারছিস সারাটা রাত 'কার ছবি, কার ছবি'—এই চিন্তায় কাটালাম। কিছুতেই মনে শান্তি পেলাম না সে রাত্রে। পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি ভুলু "'দেশ'টা হাতে নিয়ে এসে হাজির। শেষে খুলে দেখি তোর ছবি। দুজনে মিলে সেটাকে নিয়ে খুব খানিকক্ষণ হৈ চৈ করলাম, তারপর ভুলু বলে বসল 'চল পূর্ণিমাকে একটা অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিই।' শেষে আমি ওকে বললাম আমি তো শিগ্‌গির ওখানে যাচ্ছি মুখেই জানাব অভিনন্দনটা, তাতে ও দাবী করে বসল আগে ওরটা জানাতে হবে।"—সেদিন এ ঘটনাটা বিশ্বজিৎদার মুখথেকে শুনে বুঝেছিলাম ভুলুদা আমাদের কতখানি ভালবাসেন। কিন্তু আজ আর এ স্নেহ, ভালবাসা তাঁর কাছ থেকে পাব না, তিনি আমাদের থেকে অনেক দূরের আর এক জগতে চলে গেছেন।

ভুলুদা এরপর ১৯৬৩ সালের ১৫ ই আগষ্ট মস্কোর চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এলেন, কলকাতায় 'আনন্দবাজার' অফিসে কাজ করবেন বলে। দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে শান্তিনিকেতনে এসে চেনা লোকদের দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর আবার অভিনন্দন জানালেন 'দেশটার' জন্য। আর খুব উৎসাহ দিলেন খেলাধুলাটাকে চালিয়ে যাবার জন্য। এই তো সেদিনও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই বললাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার এই অভিনন্দনের কথাটুকুই যে শেষ কথা সেদিন কি তা জানতাম? এর দুদিন পরেই শুনলাম তিনি অসুস্থ। দেখতে যাব ঠিক করলাম। যেদিন দেখতে যাব বলে ঠিক করলাম সেদিন শুনলাম তিনি ভাল হয়ে গেছেন। ভাবলাম তাহলে পরে গিয়েই দেখা করে আসব। সেদিন বুঝিনি—আমি কতবড় ভুল ও অন্যায় করলাম কিন্তু আজ প্রতিপদেই নিজের ভুলের জন্য নিজেকে

ধিক্কার দিচ্ছি। এর দুদিন পরেই শুনলাম তিনি খুব অসুস্থ, কোলকাতায় না নিয়ে গেলেই নয়—তাঁকে নিয়ে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা চলে গেলেন কলকাতায়। প্রতিটি সকাল ও বিকাল উদ্বিগ্নে, উৎকণ্ঠায় সময় কাটাতে লাগলাম—যদি শুনি 'ভাল আছেন', আনন্দে আত্মহারা হতাম, আর যদি শুনি 'ভালনয় খারাপ অবস্থা চলছে' সারাদিন সারারাত ভগবানের কাছে তাঁর পরমায়ু লাভের জন্য প্রার্থনা করে কাটিয়েছি। ক্রমাগত প্রায় ছয় সাত দিন এইভাবে কাটানোর পর সকলেই মনে করলাম নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন, কিন্তু সকল আশার আলোক নিভে গেল আকস্মিক একটা প্রচণ্ড আঘাতে। যখন শুনলাম ভুলুদা নেই,—এই সুন্দর আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর থেকে মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সংবাদটা এতই অবিশ্বাস্য যে খানিক্ষণ পাথরের মতন বসে রইলাম। বিশ্বাস করতে পারলাম না; মনেহল সমস্ত কিছু আমার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে, অনুভব করলাম কয়েকফোঁটা তপ্ত চোখের জল কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, ভেঙে পড়লাম বিছানার ওপর। কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানিনা—তবে বেশ কয়েকটা দিন নিজেকে কোলাহল থেকে দূরে নির্জনে সরিয়ে নিয়ে যেতাম, অনুভব করতাম নির্জন দুপুরে বা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে অনবরত আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। সর্বদা মনে হত সকল সুআদর্শের সমন্বয়ে যে গোলাপ ফুলটি একদিন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল আশ্রমের বুকে, আজ তাঁকে মৃত্যু এসে সযত্নে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। সে ফুলটি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বের কাছে বিকশিত করবার সময়ও পেল না। তাঁর এই কলকাতাতে যাওয়াই যে শেষ যাওয়া এমন কথা কে ভেবেছিল? কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষাও তাঁর সে মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারল না, ভয়ঙ্কর সেই মৃত্যু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। কখনো কি ভেবেছি যে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সেই মৃত্যু এসে তাঁর জীবনের সমস্ত আনন্দের মাঝখানে পথরোধ করে দাঁড়াবে? কখনো তো মনে আসেনি সেই সদাহাস্যময় ভুলুদাকে আকস্মিক মৃত্যু এসে এই আলোকময় পৃথিবী থেকে সেই চন্দ্রকলার দেশে পৌঁছে দেবে? এত বেদনা কেন, এত দুঃখ কেন? অতি প্রিয়জন চলে গেলেই শোককে আমরা এমন ভাবে আঁকড়ে ধরি কেন? এর উত্তর রেখে গেছেন ভুলুদা তাঁর ভালবাসার মধ্যে।

ছাত্রকে গুরুদেব যেমন ভাবে পেতে চাইতেন, ঠিক তেমটিই ছিলেন ভুলুদা—গানে নাটকে, আবৃত্তি-পাঠে, খেলাধুলার উৎসাহের সঙ্গে সৎআদর্শ ও লেখাপড়ার এমন সমন্বয় কখনো তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না? একদিন যে ক্লান্তিকে, মনের বেদনা বা দুঃখকে ভুলিয়ে রাখত গানের সুরে; পথঘাটকে মুখরিত করত প্রাণখোলা হাসিতে সেই মানুষটি আজ কোথায়? পবিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরা যে মুখখানি আশ্রমের আলো জেলে

রেখেছিল, সেই আলো, সে চিরজীবনের মত নিভিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু মাত্র আশারবাণী রেখেগেছেন তাঁর জীবনের পথখানিকে তুলে ধরে। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরাও হয়ে উঠুক তাঁর মতন। তাঁর জীবনের পথই পাথেয় হয়ে উঠুক সকলের কাছে, এর চেয়ে সান্ত্বনার বাণী আর কি হতে পারে? তাঁর জীবনের অপূর্ণতার দিকগুলোকে পূর্ণ করে তুলুক। এই আশ্রমের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিক তাঁর মতন—তাঁর মতন সদাহাস্যময়, আনন্দ-উচ্ছাসময় জীবন ভরিয়ে তুলুক আশ্রমের জীবনকে, তাহলেই তো তাঁর আত্মার পরম তৃপ্তি। সব ঝাপসা হয়ে আসছে—তাঁর আত্মার কল্যান হোক্, শান্তি হোক-এই প্রার্থনা আজ আমাদের। তাঁর জীবনের মন্ত্র-স্বরূপ প্রিয় যে গানখানি ছিল, সেই 'যা পেয়েছি প্রথমদিনে, তাই যেন পাই শেষে' গানখানি হয়ে উঠুক আমাদের জীবনের মন্ত্র। এই অমৃতবাণীইতো রেখে গেছে একমাত্র সান্ত্বনা।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'

শ্রীশ্রীমন্তকুমার জানা

সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অবিসংবাদিত ভাবে স্থায়ী আসন পাবার অধিকারী। ভাববৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি কাব্যসাহিত্যে এক নূতন সুরের প্রবর্তক।

নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় ও দৃঢ় সত্য ভাষণে, এবং অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণায় সুকান্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের শিল্পীযোদ্ধা। যুদ্ধক্লিষ্ট পৃথিবীতে তিনি সূর্যসন্ধানের কবি।

'ছাড়পত্র' (প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়: ১৩৫৪) সুকান্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। মূলতঃ ত্রিধারার যুক্তবেণী 'ছাড়পত্র'। রক্তাক্ত যুদ্ধ ও সংখ্যাহীন মৃত্যু, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, সর্বহারার হাহাকার ও ক্রন্দন, বুভুক্ষা ও মহামারীর রঙ্-রেখায় 'ছাড়পত্রে'র পটভূমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং তা অগ্নিবর্ষী বৈপ্লবিক চিন্তায় রক্তিমাভ; সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট, কৃষক শ্রেণীর কর্মবৃত্তি এবং বীরপুরুষদের জয়যাত্রার অভিযানের আদর্শে 'ছাড়পত্র' সাধারণ মানুষের নিকট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তাবাহী। ছাড়পত্রের ভূমিকার একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে'র রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয় পরাজয় আর উত্থান পতনে, সুখ দুঃখ আর আশা নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে"।[১]

যুদ্ধসংক্ষুব্ধ দোদুল্যমান পৃথিবীতে একুশ বৎসরকাল সুকান্তের অবস্থিতি (সুকান্তের জন্ম—৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩, মৃত্যু—২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪)। এই সময়কার পৃথিবীর ইতিহাস প্রধানতঃ দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস। এই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস খুব জটিল ও অন্ধকারময়। একদিকে বিদেশী শাসকের নির্মম অত্যাচার, মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকদের মরণপণ আন্দোলন, অন্যদিকে ধনিক ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার আকাশপাতাল প্রভেদ ও অবস্থার তারতম্য,—বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী—সবমিলে ভারতের আকাশে প্রবল ঝঞ্ঝার আলোড়ন। সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ যুগের বাস্তবকাব্য নির্মাতা। সুকান্ত নিজের পরিচয় দিয়েছেন—

*   *   *

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

১ দ্রঃ ভূমিকা—ছাড়পত্র—পৃ-২

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ জাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে"।[২]

মোটামুটি ভাবে ধরতে গেলে রবীন্দ্র তিরোধানের পর থেকেই সুকান্ত-প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধকীর্ণ ক্ষতবিক্ষত বিমর্ষ পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে কণ্টকিত। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত 'ঝড়োযুগের মাঝে' 'দিন বদলের পালা'য় বিশ্বাসী[৩] এবং…মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশে[৪] গভীর আস্থাবান, তবুও তাঁকে বিদায়ের পূর্বে বলতে হয়েছে—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।[৫]

অন্যায় ও দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে 'ছাড়পত্র' রক্তের অক্ষরে লিখিত।

॥ ২ ॥

মহাপ্রস্থানের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে আভিজাত্য ও কবিখ্যাতির সংকীর্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকার ফলে তিনি নিম্নশ্রেণীর জনগণের কবি হতে পারেন নি। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে তিনি যা

২ রবীন্দ্রনাথের প্রতি—ছাড়পত্র
৩ জন্মদিন—১৩নং কবিতা
৪ কালান্তর—সভ্যতার সংকট
৫ প্রান্তিক—১৮নং কবিতা

পরিবেশন করতে পারেন নি, সেই সাহিত্যিক কর্মের দায়িত্ব বহন করার জন্য তিনি অনাগত নূতন যুগের কবিকে সশ্রদ্ধ আহ্বান করে গেছেন—

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের
মর্মের বাসনা যত করিও উদ্ধার
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার।
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ এই মরুভূমি
রসেপূর্ণ করি দাও তুমি।
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।*

সুকান্তই প্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্যে…"অখ্যাতজনের নির্বাক মনের কবি।" পূর্বে যদিও কোনো কোনো কবির কবিতায় ইতরের, ছুতরের, মুটে মজুরের কবি হওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—তা শৌখীন মজদুরী মাত্র। সুকান্ত নতুন যুগের 'সার্থক কবি—সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যাঁর গভীর একাত্মতা গড়ে উঠেছিল। তাই সুকান্তর কাব্যে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ ও আশানিরাশার জীবনচিত্র এমন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রার্থী, একটি মোরগের কাহিনী, সিঁড়ি, কলম, সিগারেট, দেশলাই কাঠি—প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে নির্বিশেষ (Absolute) ভাবে দরিদ্রনিম্নশ্রেণীদের দুঃস্থ জীবনযাত্রার বিভিন্নদিকের সুন্দরচিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। 'প্রার্থী' কবিতায় রয়েছে গরম-বস্ত্রবিহীন মানুষের শীতের কবল থেকে রাত্রিকালে রক্ষা পাওয়ার প্রক্রিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মানুষের সূর্য প্রার্থনা—

* *

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কতোকষ্টে আমরা শীত কাটাই।

* *

* জন্মদিনে—১০নং কবিতা

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

'সিঁড়ি' কবিতায় ঐশ্বর্যশালী ধনিকশ্রেণীর ও সহায়সম্বলহীন অতি দরিদ্রশ্রেণীর জীবন-যাত্রার পরিচয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক আবেগবিহীন স্তব্ধতায় অভিব্যক্ত। দরিদ্রশ্রেণীর কর্মের ভিত্তিতে ধনিকশ্রেণীর অট্টালিকা নির্মিত এই সত্যটির সহজ প্রকাশ চমৎকার—

আমরা সিঁড়ি
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও।...

'একটি মোরগের কাহিনী'র মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অট্টালিকায় অনাথভৃত্যস্থানীয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণত্যাগের কাহিনীটি খুব মর্মস্পর্শী। একটি মোরগ বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে আশ্রয় পেয়ে যায় হঠাৎ। আশ্রয় মিললো কিন্তু উপযুক্ত আহার মিলল না। মোরগ সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কোনো সহানুভূতি মিলে না। তারপর একদিন সে প্রাসাদে প্রবেশ করলো "খাবার হিসেবে।"

'সিগারেট' কবিতার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বিলাসব্যসন ও ঐশ্বর্যভোগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য কর্মরত নিম্নশ্রেণীদের প্রাণের ক্ষয়িষ্ণুতার পরিচয় বেদনাপূর্ণ—

আমাদের দাম বড়ো কম এই পৃথিবীতে।
তাই কি তোমরা আমাদের শোষণ করো ?
বিলাসের সামগ্রীহিসাবে ফেলো পুড়িয়ে ?
তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই !
তোমরা নিবিড় হও আমাদের উত্তাপে।

এরপর বিদ্রোহীভাবপূর্ণ কবিতার আলোচনায় আসা যাক। এই জাতীয় ভাবধারায় দুই প্রকার কবিতা দেখা যায়। ধনিক শ্রেণী সৃষ্ট অসাম্যের বিরুদ্ধে—ধনিকদের হৃদয়হীনতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবির অন্তরের বিদ্রোহ এবং তৎকালীন শ্রেণীসংঘর্ষের চিত্র।

সুকান্ত লেনিনের বিপ্লবীভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। পৃথিবীর যেখানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব— সুকান্তের দৃষ্টিতে সেখানে লেনিনের সংগ্রামশীলতার আদর্শের জয়জয়কার[৭]।

ইতালি, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।

লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন॥

'ঠিকানা'—কবিতায় বৃহৎজনজীবনের সঙ্গে সুকান্তের নিবিড় একাত্মতার পরিচয় রয়েছে—

হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকো পথ,
তাইত পথের নুড়িতে গড়বো
মজবুত ইমারত।

এর মধ্যে শুধু ক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তি নয়—সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়গত ভবিষ্যতের চিন্তা।

মুক্তিকামী বিপ্লবাত্মক অভিযানকর্মের সঙ্গে সুকান্তের আত্মিকযোগ স্বদেশ থেকে বিশ্বে বিস্তৃত—

আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে।

৭ লেনিন বিশ্বগ্রাসী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। ধনতন্ত্র তাঁর নিকট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সর্বনাশাত্মক ব্যবস্থা বলে মনে হত। বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রের অবসান সাধনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

জালালবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেকঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

সিগারেট, দেশলাই কাঠি, মজুরদের ঝড়—প্রভৃতি কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় ধনিক শ্রেণীর শাসন শৃঙ্খলে অত্যাচারিত দ্রারিদ্র্যগ্রস্তদের সংগ্রামী মনোভাব।

আর আমরা বন্দী থাকবো না
কৌটায় আর প্যাকেটে,
আঙুলে আর পকেটে ;
সোনা বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ।
আমরা বেরিয়ে পড়বো,
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিটকে পড়বো তোমাদের হাত থেকে।
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্ব'লে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো তোমাদের,
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতকাল।
—সিগারেট,

এই মনোভাব আরো ব্যপ্ত হয়েছে "দেশলাই কাঠিতে"—

আমরা বন্দী থাকবো না তোমাদের পকেটে পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব—
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
আমরা বার বার জ্বলি নিতান্ত অবহেলায়—
তাতো তোমরা জানোই।
কিন্তু তোমরা তো জান না :
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই শেষ বারের মতো।

জনগণের অন্তরের বিপ্লবীচেতনারঞ্জিত অস্ফুট ভাষাকে সুন্দর বাণীমূর্তি প্রদান করেছেন সুকান্ত।

শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ ও বিপ্লব আন্দোলিত হয়ে উঠেছে 'কলম', 'মজুরদের ঝড়'—প্রভৃতি কবিতায়।

কলম। বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো,
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ;
উদ্বেগ আকুল হোক প্রিয়া যতো দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ ধর্মঘট হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে ॥

কোনো কোনো কবিতায় উত্তেজিত সুকান্তের কণ্ঠে প্রচণ্ড আদিমতার গর্জন ধ্বনিত হয়েছে—

(১) হৃদেতৃষ্ণার জল পাপে কতকাল?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল;
তুমি কোন দলে? জিজ্ঞাসা উদ্দাম:
গুণ্ডার দলে আজো লেখাওনি নাম?
—ডাক

(২) শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হোলো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
—বোধন

অসংখ্য মানুষের প্রাণনাশ ও মানবতার উৎপীড়নই কবিকে এরূপ হিংস্র করে তুলেছে।

'চিল'-কবিতায় তাই ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রের ভয়াবহ অবসানের চিত্র—

পথ চ'লতে চ'লতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল!

* * *

গম্বুজ শিখরে বাস ক'রতো এই চিল,
নিজেকে জাহির ক'রতো সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে ;
হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিতো আকাশের নীলে—
অনেককে ছাড়িয়ে ; একক :
পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে।

* * *

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশ-চ্যুত এক উদ্ধত চিলকে ॥

উত্তেজনা-বিক্ষোভ-বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ,-মৃত্যু-ক্ষয়-ক্ষতির উর্দ্ধে সুকান্ত শেষ পর্যন্ত গভীর সত্যে বিশ্বাসী। অভুক্ত কৃষক ও কারখানায় ক্লান্ত শ্রমিকের জন্য তিনি রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল আনার চেষ্টায় রত। রবীন্দ্রঐতিহ্যে তিনি আস্থাবান—"এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে, তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে"...। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতি)। তিনি দেশের যৌবনশক্তিকে ডাক দিয়েছেন স্বদেশ থেকে সমস্ত জঞ্জাল আবর্জনা দূর করে জীবনকে আদর্শে ও কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত করার জন্য।—

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,

* *

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টীমারের মত চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

*   *   *

এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
—আঠারো বছর বয়স

পরাধীন ভারতবর্ষের অন্ধকারে সুকান্তের বাস—কখনো তিনি ক্ষুব্ধ, কখনো তিনি উচ্চকিত, তবুও কিন্তু তিনি একজায়গায় এসে শান্ত। ধ্বংসের প্রান্তরে অন্ধকারে তিনি আগামীদিনের বংশীধ্বনি করেছেন। শেষ পর্যন্ত আগামী দিনের ফুলগন্ধময় সবুজস্বপ্নে রঙীন 'ছাড়পত্র।' জীর্ণ পৃথিবী থেকে মৃত ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে নবজাতক মানব শিশুর সুন্দর বাসভূমি নির্মাণের জন্য শিল্পীকর্মী সুকান্তের দৃঢ় অঙ্গীকার—

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবে।—তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সবকাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাবো আশীর্বাদ
তারপর হবো ইতিহাস।
—ছাড়পত্র

আগামী দিনের শিশুর মধ্যে বেঁচে থাকবে কবির সত্তা। সেই শিশুর কর্ম, চিন্তা, ও সাধনা এবং সৃষ্টির মধ্যে তা বৃহত্তরভাবে প্রকাশিত হবে—

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ,
মাটিতে লালিত, ভীরু শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।

যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে…
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
—আগামী

পরিশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে শিল্পের বিচারে সুকান্তের অনেক কবিতা যুগোত্তীর্ণ নয়। যুগযন্ত্রণা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ কবিতার আবেদনও আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসবে।তবুও ঐতিহাসিক দিক থেকে তার মূল্য থাকবে: একটা যুগের বাস্তব পরিচয় রয়েছে সুকান্তর কাব্যে যা জীবনপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় গ্রথিত।

তানসেন ঃ কবি ও সুরগুরু

প্রতিমা রায়

এই প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে তানসেনের কাব্য ও সংগীত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচিত হচ্ছে। তানসেন যেমন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তেমনি ছিলেন কবি। ব্রজভাষায় রচিত রাগমালা ও সংগীতসার নামক গ্রন্থদ্বয় এবং কিছুসংখ্যক ধ্রুপদের পদ তাঁর রচিত বলে জানা যায়। উক্ত একটি পদাবলীর আরম্ভ এইরূপে করেছেন।

সুর মুনি কো পরণাম করি সুগম করৌ সংগীত।
তানসেন বাণী সরস, জান জান কী প্রীতি ॥১॥
দেখৌ শিবমত ভারত মত, হনুমান মত জোই।
কহৈ সংগীত বিচারি কে, তানসেন মত সোই ॥২॥

অর্থাৎ সুরের গুরুকে নমস্কার। সংগীত আমার নিকট সুগম হোক। এবং শেষ দুই পংক্তিতে তাঁর সাংগীতিক মতবাদ প্রকাশ করেছেন এই বলে শৈব, ভরত ও হনুমন্ত মতের সঙ্গে তাঁর অমিল নেই।

'রাগমালায়' তিনি সংগীতের সংজ্ঞা, লক্ষণ, প্রকার যথা মার্গ ও দেশী নাদ এবং লক্ষণ, নাদ ভেদ ইত্যাদি এবং মাতঙ্গ, আচার্য্য এবং বিজ্ঞানেশ্বর মতাদির বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া রাগের লক্ষণ ও অলঙ্কারাদিরও পরিচয় দিয়েছেন। তানসেন অষ্টাশীতি রাগের বর্ণনা ও তাদের লক্ষণগুলি ছন্দে সুন্দর ভাবে গ্রথিত করেছেন। যেমন—

পটমঞ্জরী রাগের বর্ণনা :

মারু ধবল, ধনাসিরী, কেহি ভরিয়ে চারি।
এক সুর কৈ গাইয়ে, পটমঞ্জরী বিচারী ॥ ২৩৪ ॥

রাগ বেলাবলি :

জহাঁ বেলাবল গাইয়ে, এক সঙ্গ সারং
বেলাবলি সো জানিয়ে হোত সুনত সুখ অঙ্গ ॥

সংগীতসার কাব্যে তানসেন শ্রুতি মূর্ছনা বাদ্যভেদ এবং তালের বর্ণনা করেন ও সংগীতরত্নাকর গ্রন্থের তানপাধ্যায় নামক যে অধ্যায়টি আছে তার মতানুসারে তিনি বিভিন্ন তালের রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। তানসেন রচিত পদগুলি স্বচ্ছন্দভাবে রাগাদির শ্রুতি মূর্ছনা ইত্যাদির লক্ষণ নির্দেশ করে। ভরতমুনি যে সব তালের বর্ণনা করেছিলেন সেই তালগুলি নিয়েও তিনি পদ রচনা করেছেন। তাঁর পদাবলীতে ভাষাগত লালিত্য লক্ষণীয়।

তাঁর ধ্রুপদের পদগুলি প্রধানতঃ ভক্তিরসাশ্রিত। যদিও জীবনে তিনি ইসলাম

ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি তাঁর রচিত পদাবলীতে বৈষ্ণব ভাব সরস সরলতায় ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা কথনের সঙ্গে তিনি রামচন্দ্র ও শিবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। যদিও অধিকাংশ পদই কৃষ্ণলীলার।

আমরা জানি যে ধ্রুপদের জন্য যে পদগুলি রচিত হয় তাতে চারিটি করে 'তুক' থাকে। তানসেন ও সেই পন্থা অবলম্বন করে চারটি করে কলি রচনা করেছেন। তানসেনের পদগুলি সহজ ছন্দে রচিত, অনায়াসে গেয় এবং অযথা অলংকারের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

আজ কান্‌হা বৃন্দাবন মুরলী বাজাই সুখদাই হ্যা
স্বর্গলোক নরলোক পাতাললোক সব সুন ধুন সুধ বিসরাই হ্যা।
সপ্তসুর তীন গ্রাম ইক্কইস মূর্ছনা বাইস সুত
উনচাস্ কোট তাল রঞ্জন মে ছাই হ্যা—
তাননেস প্রভু রস বস কর লিলো
ব্রজ বধূ ঘর জোড় শ্যাম জুপৈ আই হ্যা॥

অর্থাৎ—আজ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সুখকর বংশীধ্বনি করেছেন। সেই ধ্বনি শুনে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালবাসী প্রত্যেকে আত্মবিস্মৃত। প্রতি রন্ধ্র থেকে সপ্তসুর একবিংশ মূর্ছনা এবং উনপঞ্চাশৎ কোটি তান উৎসারিত হচ্ছে। তানসেনের প্রভু বিশ্বমোহন তাঁরই জন্য ব্রজবধূরা আজ ঘর ছেড়ে চলেছে॥

তানসেন কৃষ্ণকে গুরুরূপে স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনির যে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি তা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছেন।

আরেকটি উদাহরণ—

ক্যাসে আছে সোভতলাল ক্যাসো মুকুট সীস কটি কিংকণী
নূপুর রুনক ঝনক ঠনকন চাপ ধরত চাল চলত গজ জয়ন্দ কী
কাছে কটি কাঁধে কামর গর সোহে বৈজন্তী মাল
মৃগমদ তিলক লালাট কোট
কাম লজ্জিত ভয়ে অধর মুরলী বজত চিত ফন্দ কী
সাঁবরে সলোনে জাত শোভা কছু কহো ন জাত চিতবর্ন নৈয়ন
বিসাল রবি সসি কী জোত ভই মন্দসী
তানসেন কে প্রভু অঙ্গন মে খেলত সব ব্রজ জন
আনন্দ মুদিত জয় বোলত বৃন্দাবন চন্দকী॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের শিরদেশে মুকুট, কটিদেশে কিংকিনী ও চরণে নূপুর রুমুঝুমু শব্দে আন্দোলিত হচ্ছে। গলায় বৈজয়ন্তীমালা এবং ললাটে তিলক অধরে তাঁহার মুরলী। বিশাল নয়ন শ্যামসুন্দরের এই যে অপূর্ব্ব শোভা তার কাছে রবি শশীর জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তানসেনের প্রভু প্রাঙ্গনে খেলা করছেন এবং ব্রজবাসীরা বৃন্দাবন চন্দ্রের আনন্দে মোদিত হয়ে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

কবি তানসেন অলংকার যোজনায় ও শব্দ চয়নে অতি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রাসের প্রয়োগ, উপমা ও অলংকার রমণীয়। উপমা প্রয়োগ তাঁর কুশলতার পরিচায়ক যদিও চিরাচরিত উপমাই তিনি ব্যবহার করেছেন।

তানসেন কৃষ্ণের বাল্যলীলার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

যেমন—

তে কহুঁ দেখ্যো রী নন্দ নন্দন কানহ মটুকী ঝটকী
কে পটকী কে পটকী গয়ো
মাখন চোরী চোরী মন লীহ্নো কীনহো নেকু ন ভর
নট জ্যোঁ উলটি কে সটক গয়ো ॥
মারগী রোক রহত যোরণ মে লজানো নয়ন সৈন দে অটক গয়ো
তানসেন কে প্রভু তুম বহু নায়ক রস গোরস লে গটক গয়ো ॥

নায়ক কৃষ্ণ শৈশবে গোপালের ভূমিকায় কেমন অভিনয় করতেন তার সুন্দর সরস রূপ তানসেনের কাব্যে পাই।

উক্ত অংশে কৃষ্ণের বাল্যের চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তানসেনের কাব্য পাঠ করলে মনে এক মধুর রসের সঞ্চার হয়। তিনি মনের আনন্দে ও নিঃসঙ্কোচে রাধা কৃষ্ণের বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর পদাবলীতে বৃন্দাবনের রূপ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। রাধার বর্ণনায় তানসেন তার অপূর্ব শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছেন—

"ইন্দু সে বদন নয়ন খঞ্জন সে কণ্ঠ কোকিলা বচন সুহাই
নাসা কীর অধর বিদ্রুম দাড়িম দসন—দমকাই ॥
শ্রীফল উরোজন গ্রীব কপোত বৈনী নগন সী সুখদাই।
কটি কেহরী কদলী জংঘ পদ সরোজ পদ্মা সী
তানসেন এসী তে বল বল জাই"

রাধার দেহ সৌষ্টব বর্ণনার জন্য তানসেন যে উপমার ব্যবহার করেছেন তা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। শতদিক হতে রাধার লাবণ্য ঝরে পড়ছে, এই রূপ চোখে ভেসে উঠে। রাধার বিরহ ও সুন্দর বর্ণিত হয়েছে।

নীদ ন আবত পিয় বিন দেখ মোরী আলী
ক্যাসে পরে অব চৈন
ঘরি ঘরি পল ছিন য়োঁহী বীত জাত রহত মারগ জোহত নয়ন
বিন দেখে কল ন পরত হ্যা মানো মন মোহত হ্যা মৈন
অব কবঠোঁ মিল প্রাণ প্যারো ইহ প্রভু তানসৈন ॥

রাধার চোখে ঘুম নেই। দিবা রাত্র তিনি দয়িতের জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন। কী রূপে আর ধৈর্য্য ধারণ করবেন। রাধা কেবল পথের দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। কখন প্রাণ-প্রিয়র সঙ্গে তাঁর মিলন হবে? রাধার প্রাণপ্রিয় হলেন তানসেনের প্রভু ॥

তানসেন তাঁর কাব্যে রাধার বিরহ ও রাধার প্রতীক্ষায় প্রকৃত নয়িকার আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। তানসেন সংগীত শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর কাব্য প্রতিভা সংগীতের তুলনায় গৌন। 'আইন—ই আকবরি'তে এবং 'আকবর নামা' গ্রন্থে আবুলফজল তানসেনের কাব্যের উল্লেখ কোথাও করেন নি কেবল 'তুজুক জাহাঙ্গীরী' তে তাঁর কাব্যের উল্লেখ পাই। পরবর্তী লেখকদের রচনার সাহায্যে আমরা উপরোক্ত আলোচনা করলাম ॥

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

কাজী কামরুজ্জামান

ভবভূতি তাঁর "মালতী মাধব" পুস্তকে বলেছেন—"কালোয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী"। বিরাট এই পৃথিবী আর এই পৃথিবীর উপর নিরবধি কাল জুড়ে মহাকালের আবর্তন। যুগ যুগান্তর ধরে মহাকাল এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। তাঁর চলার পথে পথে কত সভ্যতার উদয় হচ্ছে। আবার কত সভ্যতা ধূলিতলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অতীতের কত মানুষের কীর্তি, কত জয়পরাজয়ের পদাবলী সব মহাকালের নির্মম পরিহাসে কোথায় বিলিয়ে গেছে। কিন্তু সব কিছুকে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। অতীতের অন্ধকার গুহাতলে অতি সাবধানে ইতিহাস দেবতা অতীতের পরিচয় বাহী প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাই মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার মৃত্তিকা থেকে বেরিয়ে পড়ে হাজার হাজার বছরের পুরাতন ও উন্নত 'সিন্ধুসভ্যতা'। মিশরের মোমি থেকে পাওয়া যায় রাজরাজাদের পূর্ব ইতিহাস। মহাকালের নির্মম ভ্রুকুটীকে উপেক্ষা করে ইতিহাস বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগ রক্ষা করে চলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

> সেই ভালো প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান
> সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
> অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে
> তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
> বেজে উঠে গানখানি
> তার মাঝে সুদূরের বাণী
> কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে।[১]

কোন বর্তমান যুগ কেবল বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে, অতীতের সংগে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ ভাবে রয়েছে তার একটা নিবিড় যোগ। সেই সংযোগের ফলেই সে সম্মুখের দিকে গতিশীল।

অতীতের জীবনাদর্শ ও কর্মধারা নিভৃতে বর্তমান যুগের মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অতীতের যুগ তাই মৃত নয়। সে সজীব, সক্রিয় ও বেগবান। অতীত জীবন 'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন' বটে কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে মৌনবাণীর মুখর চাঞ্চল্য জাগে অতি গভীরে—

১ পুরবী, অতীত,কাল।

কথা কও, কথা কও,
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও কথা কও।[২]

মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের পরোক্ষ যে যোগ রয়েছে তাকে চর্চার দ্বারা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের দ্বারা বলিষ্ঠ ও ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে। ইতিহাসের যেমন একটা অতীত রূপ আছে তেমনি তার একটা বর্তমান জীবনও রয়েছে। অতীতের সংগে বর্তমানের প্রকৃত সামঞ্জস্য স্থাপিত হলে মানব জাতি তথা সভ্যতার অগ্রগতি। অতীত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ গুণাবলী নিয়ে বর্তমানের ইতিহাস তৈরী করতে হয়। আবার বর্তমানের স্পষ্ট ইতিহাস ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ণয় করে। দেখা গেছে এক একটা জাতীর জীবনে বারে বারে অধঃপতন ঘনিয়ে এসেছে। তার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা যায় ইতিহাস চেতনার অভাবই তার সর্বনাশের মূল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ইতিহাসজ্ঞানের অভাব মূলত বারে বারে ভারতের দুঃখ ও দুর্দিনের প্রধান কারণ। ইতিহাসবোধ না থাকার জন্য অতীতের যুগ থেকে আধুনিক যুগে ভারতের উপর নানা আক্রমণের স্রোত বয়ে গেছে। গ্রীক, শক, হুন, তুর্কী, পাঠান, মোগল এবং ইংরেজের আক্রমণে পর্যুদস্ত ভারতের অবনতির কারণ দেশবাসীর ইতিহাসজ্ঞানের অভাব।

ইতিহাসজ্ঞানের অভাব থাকলে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। তেমনি ইতিহাসের ভুল শিক্ষাও জাতিকে অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যায়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সক্রিয়তা ইতিহাস শিক্ষার প্রধান গুণ হলেও কল্যাণ চিন্তায় এর প্রকৃত সত্য। মিথ্যা ইতিহাসের মোহান্ধকার দূরীভূত ক'রে জীবন চর্চা ও কর্মবৃত্তিকে সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, জার্মানীর হিটলার ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুল পথে প্রয়োগ করে সাময়িক বিজয় লাভ সত্ত্বেও স্বদেশকে এক অবনতি ও চরম ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার জার্মান জাতিকে

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাহিনী—'অতীত'

ইতিহাসের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে জার্মানরাই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আর্য জাতি—ও তারা সুসভ্য। সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করার বিধি প্রদত্ত অধিকার নিয়ে আর্য জাতি জার্মানরা জন্মেছে। এই ইতিহাসের শিক্ষা কত সক্রিয় ও প্রভাবশীল আমরা হিটলারের জার্মানে তাঁর পরিচয় পাই। কিন্তু 'ইতিহাস দেবতা' ইতিহাসের সত্যকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করার শক্তিগর্বতা স্বীকার করেননি। হিটলার সাময়িক জয়ের উচ্চশীর্ষ থেকে মৃত্যুর অন্ধকারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। তাই সব সময় ইতিহাসের সত্য আদর্শকে গ্রহণ করে মানুষকে তার কর্মের পথে চলতে হবে।

ইতিহাস শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের সামগ্রিকতা। এই সম্পর্কে চিন্তাশীল লেখক প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন*—"ইতিহাসজ্ঞান ছাড়া যে সংস্কৃতির মর্মার্থ যথার্থভাবে হৃদয়ংগম করা যায় না, এ কথা প্রাচীন ভারতীয়রাও সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। মহাভারত যে মূলতঃ ইতিহাস, একথা মহাভারতেই পুনঃপুনঃ উক্ত হয়েছে। যেমন আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে।

তপসা ব্রহ্মচর্যেন ব্যস্য বেদঃ সনাতনম।
ইতিহাস মিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥

অর্থাৎ—'তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সনাতন বেদবিভাগ সমাপ্ত করে সত্যবতীসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুণ্য ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত রচনা করেন।' এই অধ্যায়েই পরে বলা হয়েছে—

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

অর্থাৎ—'ইতিহাস পুরাণের জ্ঞানের দ্বারা বেদজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করবে; কেননা ইতিহাস জ্ঞানহীন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে প্রহার করবে এই ভেবে বেদ ভীত হয়।' ইতিহাস ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এবং ইতিহাসজ্ঞানহীনের হাতে বেদ মার খায় অর্থাৎ অপব্যাখ্যাত হয়, দেখা যাচ্ছে এই উপলব্ধি প্রাচীন কালেই হয়েছিল। এইজন্যই অন্যত্র স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—পুরাণ পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতি জ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। এসব স্থলে ইতিহাস পুরাণ মোটামুটি একার্থক এবং বেদ বা শ্রুতি তদানীন্তন ভারতীয় সংস্কৃতিরই সূচক বলে গ্রহণীয়। ইতিহাসে বেদের পরিপূরক, কেননা ইতিহাসের দ্বারাই বেদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়—এই হচ্ছে মহাভারতের অভিমত।

* প্রবোধচন্দ্র সেন—"ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ"—
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইতিহাসের স্থান আরও উচ্চে; তাতে ইতিহাসকে অন্যতম বেদ বলেই গণ্য করা হয়েছে এবং অথর্ব বেদের পরে ইতিহাস বেদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে ইতিহাস হচ্ছে পঞ্চম বেদ। মহাভারতকে যে পঞ্চম বেদ বলা হয়, তার কারণ মহাভারত হচ্ছে, মূলতঃ ইতিহাস। ইতিহাস বেদ শিক্ষার পরিপূরকই হক বা অন্যতম বেদ বলেই গণ্য হক, ইতিহাস ছাড়া যে বেদ অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোপলব্ধি সম্ভব নয়, একথা মহাভারত ও অর্থশাস্ত্র উভয়এই স্বীকৃত। শুধু বেদার্থ নয়, বিশ্বলোক সমাজেরও স্বরূপ প্রকাশিত হয় ইতিহাসের দ্বারা। একথাও আছে মহাভারতে।—

ইতিহাস প্রদীপেন মোহাবরণ ঘাতি না।
লোকগর্ভ গৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্ ॥

অর্থাৎ—মোহাবরণ নাশী ইতিহাস প্রদীপের দ্বারা বিশ্বলোকালয় যথাযথরূপে প্রকাশিত হয়। যে মোহ বা অজ্ঞতার তিমির লোক জীবনের স্বরূপকে আবৃত করে রাখে তাকে অপসারিত করতে হলে ইতিহাসের প্রদীপ জ্বালানো চাই।"

কোন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে কোন একটি শাখার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই দেশের ইতিহাস শিক্ষা। দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান যে কোন দিকে হোক না কেন পূর্ণতা লাভের জন্য তার পরিপ্রেক্ষিতে থাকা বাঞ্ছনীয় ইতিহাস জ্ঞান। ইতিহাস শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃতির যে কোন শাখায় জ্ঞান লাভ নিষ্ফল না হলেও অপূর্ণ—ঠিক যেমন গাছকে না জেনে গাছের ফলকে জানার মতো। ইতিহাস মানুষকে জ্ঞানী ও পরিপূর্ণ করে তোলে—কথাটার বৃহৎ অর্থ রয়েছে। এই সব দিক থেকে বলা যায়—"History makes a man wise and perfect"

উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি

শ্রীসলিল দাশগুপ্ত

শহরের মোহ এড়িয়ে যদি আমরা পল্লীর নিভৃত প্রান্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবেই আমরা অন্তরের সহজতম আন্তরিকতার সন্ধান পাই। সেখানে যারা বসবাস করে তারা শিক্ষায় উন্নত না হলেও, অবসর বিনোদনের নিমিত্ত তারা যে আনন্দ উপভোগ করে তা যেকোনো শহরে আনন্দের চাইতে কম নয়। তাদেরই আনন্দের খোরাক হয়ে এখনো বেঁচে আছে উপেক্ষিত বাংলার লোক সাহিত্য।

অন্তর্মুখীন প্রতিভাবানরা চলে যান। রেখে যান তাঁদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চারচিহ্ন, গানে গল্পে কবিতায় আর ছড়ায় তাদের প্রতিভা মানুষের অর্থাৎ আমাদের মনে এনে দেয় পুষ্টি এবং তুষ্টি; যোগায় আনন্দ, প্রেরণা আর সান্ত্বনা। মন তাই আমাদের উপবাসী থাকেনা সে হয়ে ওঠে সজীব। হৃদয় হয় প্রেম প্রচুর, চিত্তে আনে ভালোবাসা, মনে মমতা, চলায় শক্তি, বলায় ভক্তি।

উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের ইতিহাস জরাজীর্ণ হলেও, তার ফাঁকে ফাঁকে আকীর্ণ কত অজ্ঞাত কবির রচনা, এবং শিল্পের চাতুর্য। আজ সবই প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। আজ পল্লী অঞ্চলে সন্ধান করতে গিয়ে শুধু কবির রচনাই পাওয়া যায়, কবি বা সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায় না।

উত্তরবঙ্গের পল্লীগায়কেরা টানা সুরে যে সব গান গায়, তাকে ভাওয়াইয়া বলে। অন্যান্য অঞ্চলের ভাটিয়ালী, ধামালী, চরের গান প্রভৃতির সাথে এর সাদৃশ্য আছে। এ সব গানে সুর লহর অপূর্ব্ব, ভাবসম্পদ উপভোগ্য। এদের মধ্যেও প্রেম বিরহের মর্ম্মকথা আত্মপ্রকাশ করেছে। সহজ সরল ভাবে বর্ণনাই বাংলার পল্লীগীতিকারদের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ হৃদয়কে যে গান আপ্লুত করে সে গানই পল্লীগীতি।

হাল নিয়ে স্বামী হয়ত মাঠের মধ্যে গেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হতে চলল, কিন্তু তার ফেরবার নাম নেই, পত্নীর মনে কি হতে পারে, সেটাই সহজভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় ঐ গানে। তার অন্তরের বেদনা জানাবার জন্য কাছে কেউ নেই। স্বামীর লাঙ্গল জোয়ালকে সম্বোধন করেই সে তার দুঃখের কথা ব্যক্ত করছে।

খুটারে লাঙ্গল জোয়াল যাশের পেন্টি
মোর হালুয়ায় হাল বাওয়ায় গেইছে
বিয়ানে উঠি কইছে মোক্
মোর হালুয়া পেটের ভোকে মইছে।

আবার কখনও হয়ত প্রাণপ্রিয়তমকে ভিন্নদেশে কাজের জন্য গাড়ী নিয়ে যেতে হচ্ছে। কবে ফেরে তার কোন ঠিকানা নেই। দুরান্তরের পথে তার না জানি কত বিপদ ঘটে সেজন্যই সে গাড়ীয়াল স্বামীকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। গানের মাধ্যমেই প্রকাশ হচ্ছে তার কথা—

উত্তর দ্যাশে না যাও ও মোর গাড়ীয়াল
আরো বা বাঘের ভয়,
বনের বাঘে ধরিয়া খাইবে
মাটি হবার নয়।

স্বামী তাকে ভুলিয়ে রেখে যেতে প্রবৃত্ত হল। গাড়ী চালিয়ে সে, যা উপার্জন করবে তা দিয়ে তার জন্য সোনা কিনে আনবে তবু তার মন বাগ মানেনা। গাড়ীয়াল চলে গেল। এর পর স্ত্রীর অবস্থা কি হল সেটাই এখানে প্রকাশ পাচ্ছে গানে—

ভাত হইল খরখর রে গাড়ীয়াল
মাজান হইলরে বাসি
আর ঘন আটা দুধের খিরসালে
পড়িয়া মইল মাছি।

উত্তরবঙ্গে 'কৃষ্ণধামালী' নামে আর একপ্রকার গানের প্রচলন আছে। কালা, কানাই, কানু, মাধবকে উপলক্ষ করে যে সব গান, সেগুলোই 'কৃষ্ণধামালী'। তাকেই আবার পূর্ব্ববঙ্গের দিকে নাইয়ার গান বলে। যেমন :—

কালা আর না বাজান বাঁশরী
সাঝের ঘরে কালা রইতে না পারি।

অথবা

ও মোর কানাইরে
এলুয়া কাশিয়ার কুল
নদী হইলরে একাকুল
কেমন করিয়া হব দরিয়ার পার রে।

উত্তরবঙ্গে একপ্রকারের দেহতত্ত্ব গান শোনা যায়, ভিক্ষাবৃত্তির উপর জীবন ধারণ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় যে সব পল্লীগায়ক, তাদের মুখে। যেমন—

থাকতে পার খাটাতে তুমি পারের নাইয়া
দীনবন্ধুরে আমার দিনকি এমনি যাবে বইয়া।

এ সমস্ত গান সম্পূর্ণ দেহতত্ত্ব না হলেও দেহতত্ত্বের সঙ্গে এর মিল যথেষ্ট।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সব গান পল্লীসংগীত ব'লে আজকাল বেশী পরিচিত সে গুলি প্রায় রাজসাহী জেলার পল্লীগ্রাম থেকে উৎপন্ন। যেমন :—

রসের নদীতে সই গো ডুব দিলাম না
নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই
পাই না ঘাটের ঠিকানা।

পূর্ববঙ্গের কোনো অঞ্চলে এখনো "কৃষ্ণ যাত্রার" মতো রামায়ণের অনুকরণে পালা গানের আসর হতে দেখা যায়। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণবীদের মুখে কিছু কিছু গান শোনা যায়। যেমন :—

প্রেম নাগরে ঘর বাঁধিব
প্রেমের সাথী নিয়া
প্রাণ বঁধুয়ার মন মজাব
যৌবন ডালি দিয়া॥

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করতে এদেশে অনেক ছড়া শুনতে পাওয়া যায় শহর বাসীদের মুখে। তেমনি পল্লীবাসিদের মুখেও শুনতে পাওয়া যায় ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছড়া।

যেমন :— "আইলের থুকরা বাইলের থুকরা
আমার বাপই নাচে মাল ঘুঘরা।
একটা করি কড়ি দাও
আমার বাপইর নাচন্ দেখি যাও॥"

এমনি করে আদর করতে করতে হয়ত স্নানের সময় হয়ে যায়। গায়ে তেল মাখাতে মাখাতে ছড়া গেয়ে যায় মুখে—

"ফাঁকা-ফুকা নাউয়ের (লাউ) ফুকা (ছোট গাছ)
তিন কড়ি তেল,
আমার বাপইর ফাকা ম্যাল।"

(হাত পা একসঙ্গে করে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার সময় "ম্যাল" কথাটির প্রয়োগ)।

হঠাৎ বাচ্চা হয়ত কান্না জুড়ে দিল, তখন তাদের ভয় দেখানোর জন্যও ছড়া শোনা যায়। যেমন :—

"আয় ঘুম যায় ঘুম তেতুলের পাত,
কান কাটা শিয়াল আইসে চুপ করিয়া থাক্॥"

এমনি করে জন্তু জানোয়ারকে ডাকা হ'ত যাতে বাচ্চা ভয় পেয়ে চুপ করে থাকে। ছড়ার সাহায্যে আবার বাচ্চাদের ঠাট্টাও করা হয়। যেমন—

"ঢুল্ ঢুল্ ঢুলানি
বাপইর দিদি তেইলানি (তেল বিক্রেতা)।
তেল ধরিয়া হাট যায়—
যত যেতী পাছ্ নেয়" (পেছনে যায়)।

এছাড়া বিভিন্ন উৎসব পার্বনের গানও দেখা যায়। বিয়ের গানগুলি এর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। পাত্রীর বাড়ীতে যখন বিয়ের পাত্র পৌঁছায় তখন শোনা যায়:

"জনক রাজা ভাগ্যবান
সীতা বেটিক্ কইলে দান
নমঃ নমঃ রাম নারায়ণ।"

সম্প্রদানের সময় গাওয়া হয়:

"বালির বাবার মন্দিরের আগে জোড়া কস্যালের গাছ
একটা কসাল ছিড়িয়া বাবা সম্প্রদান করে,
সম্প্রদান করে বাবা মোছে চোখের পানি,
আজি হইতে মোর মন্দির হইল খালি
আজি হইতে মোর কোলো হইল খালি···।"

পাত্রীর বাড়ীতে বরযাত্রীরাও রেহাই পান না। তাদের উদ্দেশ করে বলা হয়:

"ময়নারে মাথার উপর চন্দনবৃক্ষের ছায়া
শব্দে শুনিচং ময়না তোর বাপ না বড়ো দাতা?
কৈ দিচে ময়না তোক্ গলা ছাইয়া হার?
দাতা তো নয় ময়না শুদায় কথা চাটা (অতি রঞ্জিত কথা বলে)।"

বিয়ের গান ছাড়া পল্লীগ্রামে পালাপার্বনের গানও প্রচুর। এখানে কার্তিক পূজার গানের কথাই বলছি। তবে কার্তিক পূজার গান সম্বন্ধে কিছু বলার আগে প্রথমে বলা দরকার ঘটনার সূত্রপাত। শংকর শুনলেন গৌরীর মৃত্যু সংবাদ। এলেন যজ্ঞে। সব তচ্নচ্ করে গৌরীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন···ধ্যানমগ্ন হলেন···তারপর হিমালয় পর্বতের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মিলন। মিলনের অব্যবহিত পূর্বের গান—

"গাবুর (যৌবন) কাল গেল বুড়া শিবের ঢুড্ডামী করিতে,
গাবুর কাল গেল বুড়া শিবের পরাক্ (অঙ্গকে) পুজিতে।"···

এইভাবে গানের মাধ্যমেই মিলন, কার্তিক গনেশ ইত্যাদি লাভ প্রকাশ করা হয়।

মেয়েদের মতো পুরুষদেরও কতকগুলি পূজা আছে। যেমন গোরক্ষ পূজা অর্থাৎ গো-পূজা। একজোড়া বলদকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে গোয়ালঘরের দরজায় রাখা হয় এবং গান গেয়ে পায়ে ফুল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। গানটি—

"আইলরে অরণ্যে
মা নক্কি—চরণে
মা নক্কি দিল বর
চাল কড়ি বার কর।"

পূজো শেষ করবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গাওয়া হয়—

"মাইগে (স্ত্রী) বলে, মহুজা (সম্বোধন)
মোর বুদ্ধি ধর
হাত্তা উপ্‌রিয়া পাটার (পাট) ভুঁই কর।"

এ সব ছাড়া পল্লী অঞ্চলের খোলা মাঠে মাঠে চাষীদের মুখে মুখে অনেক ধর্ম্মমূলক গান শোনা যায়। কর্ম্ম ক্লান্ত দিন যখন শেষ হয়ে আধার নামে, তখন দূরে সন্ধ্যা ছায়ার আধার পথে পথিক তার গান গেয়ে চলে—

"হরি বোল মন নৌকারে চালাও
সাধের জোয়ার পানে
এ জীবনে সব হারাইয়ে
ও মন ছুটী যা তুই রাঙা দুটী পায়ে।"

আবার কখনও গায়—

সাধের নৌকা ধায়—
এলুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইল বন্ধু হুলাস্থূলরে
কেমন করিয়া দারিয়া হইব পার।

উপরের গানটিতে অতি সহজেই ধরা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতির ভাব, রচনা পদ্ধতি এবং সুরের ধারা একই রকম শুধু সামান্য ভাষার পার্থক্য।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে এক প্রকারের গান শুনতে পাওয়া যায় যাকে বলে "ভাসান গান" এই "ভাসান গান"কেই পূর্ব্ববঙ্গে রয়ান গান বা "রয়ানী গান" বলে। এই গান এক নাগারে বহুদিন হয়। কারণ এর পৃথক পৃথক পালা নেই।

এই রকম বিভিন্ন ধরণের গান আমরা পল্লীসংগীতের মধ্যে পাই। আমরা পল্লী অঞ্চলের এই বিরাট দিকৃটির কথা কতটুকুই বা জানি? এমন কত গান, গল্প, ছড়া, কবিতা দিনের পর দিন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু সচেষ্ট হলেই তারা আবার জেগে উঠবে। খুজে পাব বাংলার অমূল্য সম্পদ।

বিশ্বকবি ও যুদ্ধ

অনঙ্গমোহন রুদ্র

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেছে তিন বছর আগে। এই উপলক্ষে আমাদের দেশে কর্মতৎপরতা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের বাইরে পৃথিবীর নানাদেশে যে তৎপরতা এবং আয়োজন দেখা গিয়েছিল এইটাই আমাদের গর্ব ও আনন্দকে বহুগুণিত করে। এই উপলক্ষেই যেন আমরা তাঁকে বিশেষ করে অনুভব করেছি বিশ্বকবিরূপে। এতবড় সম্মান পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কোনো কবির উদ্দেশে সারা দুনিয়া জানিয়েছে বলে জানি না। তাই কবির এই সম্মানে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাঙ্‌লা দেশ, সম্মানিত। কিন্তু এ কেবল ভাবাবেগের কথা নয়। পৃথিবীর অগণিত সাহিত্যমোদী মানুষ ভারতবর্ষের এই বিশেষ কবিকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। তাদের কাছে কবিকে আমরা বিশ্বকবির প্রকৃত পরিচয়ে উপস্থিত করতে কতখানি পেরেছি, জানি না।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচ্যের দেশগুলির ও আফ্রিকার কোন কোন দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের ঐতিহ্য ইতিহাস বহন করে। কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যেও একমাত্র গ্রীস ছাড়া কোনও দেশের প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভারতে অনুপ্রবেশের পথ ও রণ-বিজয়ের পথ বেয়ে ঘটেছিল। ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও সাংস্কৃতিক বিনিময় কতটুকু ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে একতরফা ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতের কণ্ঠ ইয়োরোপ তখনও শোনে নি। রামমোহনের কণ্ঠ ইয়োরোপে প্রথম ধ্বনিত হলেও ভারতকে তারা চিনল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পদে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। আমেরিকা ভারতকে প্রথম দেখল যেমন বিবেকানন্দের মধ্যে। কিন্তু বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারত-দর্শনে পার্থক্য ছিল। বিবেকানন্দের মধ্যে আমেরিকা ভারতীয় হিন্দুদর্শনের শ্রেষ্ঠত্বকে দেখল, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতের হৃদয়কে দেখল। পৃথিবীর দেশে দেশে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে এমন করে কোনও কবি, কোনও আদর্শবাদী ঘুরেছেন বলে জানি না। বিশ্বপ্রেমের চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্যের দেশে দেশে ভারতের সঙ্গে প্রেমের রাখীবন্ধন ঘটালেন। বিশ্বপথিক কবি সারাবিশ্বের ঘরে ঘরে গিয়ে পরিচয় ঘটিয়ে জানিয়ে দিলেন—এই ভারত; এ কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্নই দেখে না, বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। মানব-প্রেমের এই বাণীপ্রচারের মধ্যেই বিশ্ব রবীন্দ্রনাথকে দেখল, ভারতবর্ষকে দেখল।

অবশ্য 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখে যাঁরা তাঁর সমগ্ররূপকে চিনবার চেষ্টা

করেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন, তাঁকে mystic কবি ভেবেছেন। কিন্তু তাঁরাই যদি ইয়োরোপের প্রতিভূ' হতেন, তবে প্রাচ্যের এক mystic কবির জন্য এই সম্মান পৃথিবী দেখতো না' সার্থক হোত না তাঁর বিশ্বকবি নাম। মানব-প্রেমের কবি হিসেবেই তাঁর সার্থক পরিচয়। বিশেষ করে আজ যখন সারা বিশ্বে হিংসার উন্মত্ততা, তখন মানব প্রেমিক কবির বাণীকেই সমস্ত শান্তিকামী মানুষ স্মরণ করে। যে কবি দেশ ও জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীকে কোনদিন মানেন নি, সর্ব জাতির সর্বদেশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক একাত্মতা বোধের আকুতি অনুভব করে বলেছেন

"ইচ্ছা করে মনে মনে,
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ;......"

তাঁর কথা আজকের এই হিংসা-মত্ত পৃথিবীতে শান্তিকামী মানুষের কেবল প্রাণের কথা নয়, রাজনৈতিক শ্লোগান।

কবির মানবপ্রেম এত গভীর, এত ব্যাপক যে তা কেবলমাত্র শুভেচ্ছারূপেই প্রকাশ পায় নাই। নিজের দেশে তো বটেই, পৃথিবীর যে কোন কোণে মানুষের ওপর নিষ্ঠুর পীড়ন হয়েছে কবি তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। তাঁর সংবেদনশীল কবি-হৃদয় তখনই নিপীড়িত মানব-সমাজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর রচনা হৃদয়ের সেই ব্যথা বেদনায় প্রভাবিত হয়েছে। কবির অজস্র লেখায় এর প্রমাণ আমরা পাই। সুদূর অরণ্য-অটবীর ঘন ছায়ায় আবৃত আফ্রিকার আবিসিনিয়াকে ইটালীর উদ্ধত ফ্যাসিষ্ট রাজশক্তি যখন আক্রমণ করেছে, কবির চিত্ত পীড়িত হয়েছে। তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯৩৬ অব্দে তাঁর এই প্রতিবাদকে বিশ্বসাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ করে রেখে গেছেন তাঁর আফ্রিকা কবিতায়। ফ্যাসিষ্ট ইটালী যখন ইথিওপিয়াকে বিধ্বস্ত করে তখনও তিনি এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বমানবের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল বলেই তিনি যুদ্ধোন্মাদ সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে বারে বারে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খবর যখন তিনি শুনেছেন, তখনই মনে মনে পক্ষ নিয়েছেন শান্তিকামী মানুষের। কবির দূরদৃষ্টি আগে থেকেই এই রকম একটা কিছু ঘটবার অপেক্ষা করেছিল। এই যুদ্ধের বিভীষিকা কেটে যাওয়ার পর নবযুগের অভ্যুদয়ের আভাস কবি পেয়েছিলেন। যাঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের মৃত্যু ও রক্তক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সেই রোমঁ্যা রোলঁা, বারট্রাণ্ড্ রাসেলের মধ্যে কবি দেখেছিলেন সার্বজাতিক মিলনের ইঙ্গিত। কবি এঁদের শান্তির আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বলেছেন, "এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল

বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে ; সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে।" কিন্তু কবি জানেন এদেশ অপমান আর লাঞ্ছনা যারা ঘটিয়েছিল তাদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায় রচনা করতে পারবে না। তাই যুদ্ধের ধ্বংস বিভীষিকা ও বারুদের ধূম্রগন্ধ ছাপিয়ে যাদের কণ্ঠ উঠেছিল আশার দৃপ্ত ঘোষণায়—"প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই", কবি সেই সার্বজাতিক কল্যাণ-কামীদের সঙ্গে নিজেকে সগোত্র বলে বোধ করেছেন। বলেছেন, "আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি।" ...এ পক্ষ নিঃসন্দেহে বিশ্বমানবের পক্ষ।

ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানবতা-বিরোধী লোভকে, পররাজ্য গ্রাসের জঘন্য ক্ষুধাকে চিনতে কবির কোনদিন ভুল হয় নাই। পশ্চিমের সামাজ্যলিপ্সুদের বুটের তলায় প্রাচ্য দেশগুলির মানবাত্মার আর্তনাদ কবিকে পীড়িত করেছে। পীড়কের কোন প্রচ্ছন্নতার বুলি কবিকে বিভ্রান্ত করে নাই। তিনি তাদের স্বরূপকে চিনেছেন সঠিকভাবেই। "য়ুরোপ ধরণীর চারিদিকেই হাত বাড়াইতেছে—তাহাকে প্রেমালিঙ্গনের বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যখণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না।" পুরনো যুদ্ধের ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। ধনবাদ তার বাজারের সম্প্রসারণের জন্য এবং তার বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎসাদ করার জন্য এখন যুদ্ধ বাধায়। কবির কাছে এ সত্য অস্বচ্ছ থাকে নাই। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বৈশ্য ইংরেজের ভূমিকাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"এবারকার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তার রুচি নাই—রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তার নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল, এবারকার আচমকা উৎপাতে এই নেশা কিছু ছুটিতে পারে, কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।" বর্তমান যুগে বণিক সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠার কারণেই যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সংঘটন, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।" কবির প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, শোষণ ও পীড়নের জ্বালার তীব্র অনুভূতি ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে সুষ্ঠুবিশ্লেষণে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে।

যুদ্ধের উন্মত্ততা মনুষ্যত্বকে হত্যা করার জন্য, মানবসভ্যতাকে চূর্ণ করার জন্য কি ভয়াবহ রূপ ধরতে পারে কবির মানসচক্ষে তা প্রকট হয়ে উঠতো। তিনি যুদ্ধের প্রমত্ত ধ্বংসলীলার মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করতেন—অগণিত নারী, শিশু আগুনের গোলায় মর্মন্তুদ মৃত্যুবরণ করছে। বহুকালের একটি দেশের সমস্ত কীর্তি, সভ্যতা সংস্কৃতি দেবালয়

বিশ্ববিদ্যালয় লালসার মারণাস্ত্র-বর্ষণে মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কবি, সাহিত্যিক, কলাবিদ্ ও বিশ্বকর্মা শিল্পীর দল নিশ্চেষ্ট মূক হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাঁদের পবিত্র কর্তব্য এই মানব-সভ্যতাধ্বংসী প্রমত্ততার প্রতিবাদ করা। কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে জাপানী কবি নোগুচিকে লেখা তাঁর চিঠিতে। ১৯৩৮ অব্দে জাপান যখন চীনদেশ আক্রমণ করে, সেই সময় কবির বন্ধু জাপানদেশীয় কবি নোগুচি এই আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন চেয়ে চিঠি লেখেন। ব্যথিত মর্মাহত কবি যে উত্তর নোগুচিকে লেখেন, (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮), মানবসভ্যতার ইতিহাসে সেটি একখানি অমূল্য দলিল, পৃথিবীর কবি ও কলাবিদ্‌দের পথের দিশারী। এই দীর্ঘ পত্রের কিছু উদ্ধৃতি দিলেই কবির শিল্পীসত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে বলে মনে করি। কবি লিখেছেন—

"……ভাবতেও দুঃখ পাই যে, যুক্ত সমরবাদের উত্তেজনা কোন সময়ে সৃষ্টিশীল শিল্পীর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অসহায়ভাবে তার বুদ্ধিমত্তাকে যুদ্ধের অন্ধ অপদেবতার পায়ে মর্যাদা ও সত্যকে বলি দিতে পরিচালিত করিতে পারে।"

"বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমাজের একটা মূল নৈতিক কাঠামোতে মানুষ বিশ্বাস করেছে। তাই, তুমি যখন এসিয়া মহাদেশে একটা নূতন মহৎ জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য, ভয়ঙ্কর হলেও, অপরিহার্য উপায়ের' কথা বল, আমার মনে হয়, চীনের নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অপবিত্রকরণের কথাই এসিয়ার জন্য চীনকে রক্ষার উপায় হিসেবে তুমি বোঝাও। তুমি মানুষের জন্য এমন একটি জীবনটারা নির্দিষ্ট করেছ যা পশুদের মধ্যেও অপরিহার্য নয়, প্রাচ্যের পক্ষে তো প্রযোজ্য নয়ই……। তোমার ধারণায় এসিয়া গড়ে উঠবে করোটির মিনারের উপর। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি এসিয়ার বাণীতে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই বাণী এমন সব কাজের সঙ্গে সগোত্র হতে পারে যা তৈমুরলঙের হৃদয়ে তার ভয়াবহ নরহত্যার সাফল্যে গৌরব জাগাতে পারে।……"

"ইউরোপীয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক যে 'বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতার' কথা বলেছিলেন, আমাদের যুগে সেটি একটি বিপজ্জনক লক্ষণ।……আমি জানি, প্রচার একটি চারুকলায় পরিণত হয়েছে, এবং অগণতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণের পক্ষে এই সময়োপযোগী বিষকে ঠেকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব; কিন্তু ধারণা ছিল, অন্ততঃ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের স্বাধীন বিচারক্ষমতাকে নিজেরা রক্ষা করবেন। অবশ্য সব সময় তা হয় না; বিকৃত-বিতর্কের পশ্চাতে একটা বিপথগামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব আছে বলে মনে হয়, যে জন্য এখনকার 'বুদ্ধীজীবীরা' তাঁদের 'মতবাদের' সম্পর্কে

দম্ভোক্তি করতে থাকেন, আর তাঁদের দেশের জনতাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যান।”

কিন্তু জাপানে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ সাময়িকভাবে বিপথগামী হলেও ধ্বংস ও হত্যার মধ্যে মানবিক বুদ্ধি-বৃত্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে না—এ বিশ্বাস কবির মনে দৃঢ় ছিল। কারণ—

“……দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।”

সেইজন্য ঐ চিঠিতেই তিনি লিখেছেন,

“প্রকৃত এশীয় মানবতা আবার জন্ম নেবে। কবিদের কণ্ঠে আবার গান উঠবে, মানুষের সেই ভাগ্যের প্রতি তাঁরা অকুণ্ঠ বিশ্বাস ঘোষণা করবেন যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে অসংখ্য ভ্রাতৃঘাতী সৃষ্টিকে মেনে নেবে না।”

যুদ্ধ সম্পর্কে ও যুদ্ধের আবর্তে বিক্রীত-বিবেক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। কবি ও মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমনি বলিষ্ঠ, দৃপ্ত অথচ দরদী মনের একত্র পরিচয়ের এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। বর্তমানে বিশ্বে যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে, সেদিন তা ছিল না। সেদিনের পরিবেশে পরাধীন দেশের এক কবির পক্ষে এমনি দৃপ্ত ঘোষণা খুব সহজ ছিল না। তার উপর নোগুচি ছিলেন কবির প্রিয় বন্ধু। মানবতার কাছে বন্ধুত্বের দাবীকে তিনি কোনও মূল্য দেন নি। নোগুচিকে উপলক্ষ করে বিকৃত জাতীয়তাবাদকে তিনি তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন,

“……লজ্জা শরম তেয়াগি’
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার পরও কবি অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধ যে হবে তা তিনি জানতেন। মংপু থেকে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন ‘এই যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) ফসল যারা ঘরে তুলল, তারা পরবর্তী যুদ্ধের বীজ বুনে গেল’। তাঁর দূরদৃষ্টি মিথ্যা হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। এই সময় তাঁর বহু লেখার মধ্যে যুদ্ধবাদের উপর ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। যে যুদ্ধোন্মাদ জার্মানীর নায়ক হিটলার এই যুদ্ধ আরম্ভের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তার সম্পর্কে তাঁর ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে। ছড়াড় ঢঙে তিনি লিখেছেন,

“ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
দেশবিদেশে শহর-গ্রামে গলা কাটার ধুম কি।”

সেদিনও যুদ্ধোন্মাদরা

"মেসিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।"

যুদ্ধ যারা বাধায় তাদের নিজেদের স্বপক্ষে কোনো কালেই যুক্তির অভাব হয় না। নোগুচির জাপান এসিয়াটিক কন্টিনেণ্টে 'a new great world' প্রতিষ্ঠার অজুহাত খুঁজেছিল, হিটলারের জার্মানী ও মুসোলিনীর ইটালি 'কমিউনিষ্ট জুজুকে' ঠেকাতে চেয়েছিল। আজ আবার যুদ্ধব্যবসায়ীরা পৃথিবীর ত্রাণ-কর্তা সেজে 'Communist Bogey' থেকে··· পৃথিবীকে বাঁচাবার কথা বলে। এই 'কমিউনিষ্ট ভূত' নোগুচিও কবিকে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কবি নোগুচিকে যে দ্বিতীয় পত্র লেখেন (অক্টোবর, ১৯৩৮), তাতে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন,—

"তোমার নিজের লোকদের মধ্যে যদি দরিদ্রকে শোষণ না থাকে এবং যদি শ্রমিকরা স্থায্য ব্যবহার পাচ্ছে বলে মনে করে, তবে তোমাদের কমিউনিজ্‌মের ভূতকে ভয় করার কারণ নাই।"

বর্তমানের যুদ্ধ কোনও খণ্ড ভূভাগে আবদ্ধ থাকে না, যুদ্ধব্যবসায়ীরা তাকে পৃথিবী-ব্যাপী করে তোলার চক্রান্ত করে। এই নিষ্ঠুর সত্যও কবি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, "পৃথিবীর যে-কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে, সেই কোণ হইতে জগদ্‌বিনাশী ঝড় উঠিবেই"। কবির এই অনুভূত সত্য বর্তমানে কঠোর বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছে। বার বার যুদ্ধোন্মাদীরা চেষ্টা করেছে যুদ্ধকে সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দিতে। বর্তমান বিশ্বের শান্তি আন্দোলন অবশ্য এই অপচেষ্টাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু নররক্তপিপাসুদের এই অপচেষ্টাও সদাজাগ্রত।

'হিংসায় উন্মত্ত' পৃথিবীতে আনবিক যুদ্ধপ্রস্তুতির যুগে মানুষের জীবনে আজ নিরাপত্তার যখন অভাব, তখন কবির দৃপ্তবাণীকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের; বিশ্ববাসী কবিকে যেন মানবতার পূজারী হিসেবে বিশ্বমানবের দরদী বন্ধু হিসেবে চিনে নিতে পারে। যুদ্ধ-বাতিক-গ্রস্ত পশ্চিম, ভারতের শাশ্বত হৃদয়কে আর একবার চিনুক রবীন্দ্রনাথকে জানার মাধ্যমে।

আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ

অজিত হালদার

বাঁচতে গেলেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে বাঁচতে হয়। এমনকি যদি এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্যগোচর নাও হয় অথবা কেউ যদি বাঁচার পথে উদ্দেশ্য না রাখার উদ্দেশ্যকেই গ্রহণ করেন তবুও এ উক্তির যাথার্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলির সৃষ্টি হয় মানুষের ধার্মিক, সামাজিক, দার্শনিক ইত্যাদি ধারণার বিবর্তনের ফলে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর কাজ থাকে তাকে রূপদানের। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ পাওয়া যেতে পারে অনেক আর সেই সব পথের পার্থক্য নির্ভর করে দেশকালের পটভূমিতে বিভিন্ন বাধার ওপর। অনেক পথের মধ্যে একটিকে বাছতে হয় ভালমন্দ ও বাস্তববোধের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে। লক্ষ্য স্থির করার পর পথ বাছা হলে বাকী থাকে চলা। মূল্যবোধের কাজ এই তিন ক্ষেত্রে: লক্ষ্য স্থির করায়, পথ বাছায়, শেষে সেই পথে বাধা অতিক্রম করে চলা আর চালানোর ইচ্ছায়।

বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমাদের মূল্যবোধ কোন্ কোন্ মূল্যবিচারে এই তিন ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক পটভূমিতে কিভাবে কাজ করছে তারই একটি আলোচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য এই আলোচনায় অনুমান হিসেবে মানবপ্রকৃতিতে মূল্যবোধের অস্তিত্বকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হ'য়েছে। এবার আলোচনা শুরু করার আগে 'আমরা' বলতে কাদের বোঝান হচ্ছে সেটা একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। 'আমরা' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে কোনো না কোনো শ্রেণীগত সামঞ্জস্য নিহিত থাকে। এই নিবন্ধে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতার ভিত্তিতে একটি শ্রেণীগত সামঞ্জস্য স্বীকার করে নিয়ে। মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন কারা? আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার সামান্যতম সুযোগ পায়নি যে অর্ধভুক্ত-অভুক্ত ছত্রিশ কোটি সাধারণ মানুষ, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পীড়নে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ যাদের কল্পনারও বাইরে, নিশ্চয়ই তারা নয়। তাদের মধ্যে যদি কেউ কেউ থেকেও থাকেন—তবে সে সংখ্যা নগণ্য। অবশ্য কোনো দেশই মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন এমন ব্যক্তির সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় না,—তাঁরা সর্বত্রই সাধারণ হতে পৃথক স্বাধীন চিন্তার অধিকারী এবং বিশেষ করে তাঁদের চিনে নেবার সাধারণীকৃত কোনো উপায়ও নেই। তবু ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উচ্চমানের শিক্ষার সঙ্গে এই বোধের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয় না। তাই এই সচেতনতার ব্যবহারিক মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো মানের শিক্ষা। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই মাপকাঠি বাস্তবানুগ বলেই প্রতীয়মান হয়। দেশের সামাজিক নেতৃত্ব মুষ্টিমের কয়েকজন তথাকথিত

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হাতেই পড়ে। কাজেই 'আমরা' শব্দটার নিহিতার্থ এখানে দেশের সমগ্রজনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত জনসমষ্টি।

সাধারণতঃ এরকম কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে অনুমিত করা হয়ে থাকে। কারণ হিসাবে বলা হয় মানুষের প্রাথমিক মূল্যগুলি সমাজ ও সভ্যতা নিরপেক্ষ। সত্য-সুন্দরের স্বীকৃতি, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, স্নেহ-প্রেম করুণা, সংযম ও স্বার্থহীনতার বিস্তার ইত্যাদি লক্ষ্যগুলিকে মানুষের চিরন্তন কাম্য বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু এই অনুমানের বিপক্ষে দুটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। প্রথম—এগুলির সংজ্ঞা কখনই ব্যক্তিতা নিরপেক্ষ নয়, আর দ্বিতীয়—এগুলির প্রকাশ প্রায়শঃই অবাস্তব পূর্ণতার অসীমে। অর্থাৎ মানুষের প্রাথমিক মূল্যগুলিকে কখনই সংজ্ঞা দিয়ে নির্দিষ্ট 'ফ্রেমে' আটকানো যায় না, আর যদিও বা কখনও সে চেষ্টা করা যায় তবে তা এমন একটা অবাস্তব পূর্ণতার প্রতীক হয় যার ব্যাপ্তি অসীম।

মানুষের যে সব মূল্যগুলিকে আমরা প্রাথমিক ও নৈর্ব্যক্তিক বলে আখ্যা দিয়ে থাকি সেগুলি যে ব্যক্তিতা সাপেক্ষ, ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাস ও অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল তার প্রমাণ যোগাড় করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। একই যুগে এবং একই দেশে পরস্পরবিরোধী মূল্যের সহাবস্থান (শান্তিপূর্ণ নাও হতে পারে) অনেক ঘটেছে। যে দেশে যে কালে শত নরবলি কি সহস্র পশুবলি না হলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হত না সে দেশে সেই কালেই জীবে অহিংসা পরম ধর্ম বলে প্রচারিত হয়েছে। যে শতাব্দীতে যে দেশে ষাটলক্ষ ইহুদীর জীবন নির্দ্বিধায় নাশ করা হয়েছে জাতিগত মূল্যকে চরম স্বীকৃতি দিয়ে সেই দেশে সেই শতাব্দীতেই সেই কাজকে অকুণ্ঠ নিন্দা করা হয়েছে জাতিনির্বিশেষ মানবপ্রেমের মূল্যকে প্রাধান্য দিয়ে। যে দেশে যে সময়ে সমাজতন্ত্রবাদের পথ ধরে দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের তাৎপর্য অতি উৎসাহে ব্যাঘাত হচ্ছে সেই দেশে সেই সময়ে কালোবাজারের পথ ধরে অনেক জড় করার আশায় প্রায় নির্বাধায় খাবারে ও ওষুধে অনেক ভেজাল চলেছে। তত্ত্বগতভাবে বিশেষ মতানুযায়ী দেখলে এই সহাবস্থান অস্বাভাবিক নয়। মানুষের প্রক্ষোভজাত অনুভূতিকে যদি মূল্যবোধের উৎস বলে স্বীকার করা হয় তাহলে কোন্ মূল্য প্রাধান্য পাবে তার একমাত্র নির্ধারক অনুভূতিজাত আনন্দ বা বেদনা। কাজেই মানুষের মূল্যবিচার একান্ত ব্যক্তিগত।

তবে কি মূল্যবিচারকে তথ্যবিচারের পর্যায়ভুক্ত সাধারণীকৃত করা সম্ভব নয়? তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই কাজ সম্ভব কিনা তার পক্ষেবিপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া হয়েছে ও হ'চ্ছে। এখন আমরা যদি বিপক্ষের সব যুক্তিকেই নির্ভুলভাবে মেনে নিই, যদি তত্ত্বগত-ভাবে মূল্যবিচারের মধ্যে ব্যক্তিক অনুভূতির প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিই এবং মানুষের

প্রাথমিক মূল্যগুলির নিত্যতাকে অস্বীকার করি, তবুও আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শেষ লক্ষ্যকে প্রায় সাধারণীকরণের পর্যায়ে এনে অনুমিত করতে বাধ্য। কারণ সমাজের বিশেষ কাঠামোর মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে নির্দেশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হয় সেই লক্ষ্যকে স্বীকার কর, নয় তাকে অস্বীকার করে বিদ্রোহ কর। অর্থাৎ সমাজের কাঠামোকে স্বীকার করলেই তার লক্ষ্যকে স্বীকার করতে বাধ্য। এখানে ব্যক্তিক অনুভূতি ব্যষ্টির মধ্যে বিলীন। কাজেই লক্ষ্য স্থির করায় আমাদের মূল্যবোধ কিভাবে কাজ করছে তার আলোচনা করতে গেলেই দেখতে হবে আমরা বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোকে স্বীকার করছি কিনা। এবং তা দেখতে গেলে দেখতে হবে এর বিরুদ্ধে আমরা কোনো সক্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করছি কিনা। যদি তা না করে থাকি তাহলে প্রায় স্বতঃসিদ্ধান্তে স্বেচ্ছায় আমরা রাজনৈতিক কাঠামোয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিয়েছি। হয় এই লক্ষ্যের কোনো বিকল্প আমাদের দৃষ্টির সামনে নেই নয় সেই বিকল্প অনুসরণে আমাদের স্পৃহা নেই। যদি কোনো বিকল্প আমাদের দৃষ্টির সামনে না থাকে তবে সেই লক্ষ্যকে অনুমিত করতে কোনো বাধাই নেই। আর যদি সেই লক্ষ্যের বিকল্প অনুসরণে স্পৃহা না থাকে তাহলেও স্বেচ্ছায় সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিয়েছি এই যুক্তিতে অনুমিত করা যেতে পারে।

বর্তমানে যে লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হয়েছে তার কোনো বিকল্প আমাদের চোখে পড়ে না। লক্ষ্যটি 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশায়ের ভাষায় : প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন। সুখসাধনের পরিমাণবৃদ্ধির একটি আদর্শগত রূপও আজ আমাদের কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। সকলেরই সুখের উন্নতি ঘটবে যদি একজনেরও অবনতি না ঘটিয়ে অন্ততঃ একজনের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়। আর এরই চরম অবস্থায় কারো উন্নতি ঘটাতে গেলে অন্ততঃ একজনেরও অবনতি ঘটাতে হবে। এটিই কাম্য অবস্থা। কাম্য অবস্থার স্থিতি কল্পনায়। বাস্তবক্ষেত্রে এই আদর্শরূপ বা ভাবরূপকে টেনে আনতে গেলে সামাজিক সম্পদের চরমোৎকর্ষের কথাই ভাবতে হয় যা দিয়েই প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যের পিছনে আমাদের যে মূল্যবোধ কাজ করছে সাদা কথায় তার স্বরূপ হ'ল : আমার কি আর কারো অবনতি না ঘটিয়ে যদি তোমার উন্নতি হয় তবে তাতে সকলেরই উন্নতি। লক্ষ্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মূল্যটিকেই সাধারণীকৃত করা সম্ভব বলে অনুমিত করছি। এখানে সুখের সংজ্ঞা দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে আশুপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলেও আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর। কারণ মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বাস্তব চাহিদা মেটানো যে সুখসাধনের প্রথম ধাপ এতে কারো দ্বিমত নেই আর আমাদের দেশ যে ঐ প্রথম সোপান আজও উত্তীর্ণ হয় নি এও কারুর অস্বীকার করার উপায় নেই।

লক্ষ্য স্থির করার পর কাজ হল সেই অভিমুখে চলার পথ খুঁজে বের করা। এখানে খুঁজে বের করা মানে অনেক পথের মধ্যে সবচেয়ে ভাল পথটি বেছে নেওয়া। একটিকে বেছে নিতে গেলে অন্যগুলিকে ছাড়তে হয়। আবার প্রত্যেক পথেই ভালমন্দ দুই-ই কিছু না কিছু আছে। মন্দর সংখ্যা তিনচল্লিশ হলেও ভালর সংখ্যা যে পথে সাতান্ন আমরা সেই পথকেই বাছব। কিন্তু ভালমন্দ যাচাই করব কোন কষ্টিপাথরে? এখানেই আসে মানুষের মূল্যবোধ। কোনো কাজে আমরা কিছু মূল্য অর্জিত হল বলে বোধ করি আবার কোনো কাজে মনে হয় কিছু ত্যাগ করতে হল। এই মূল্য অর্জনের অনুভূতিকেই আমরা ভাল বলব,—অন্যথায় মন্দ। তাহলে মোট কথা দাঁড়াল যে, কোন পথে চলতে গেলে কিছু মূল্য অর্জন করা যায় যেমন তেমনই কিছু বর্জন করতে হয়। এই অর্জন বর্জনের পালায় সূত্রধারের শেষ বক্তব্য স্থির হয় কোন্ মূল্যকে কি পরিমাণ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার ওপর। এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য হবে বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে এই অগ্রাধিকারের পরিমাণ নির্ধারণে আমরা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা অনিশ্চয়তারোধে ও ভবিষ্যৎ আয়সৃষ্টিতে সহায়ক বলে ভোগ-সংযম ও সঞ্চয়ের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছি অধিক পরিমাণে। কিন্তু এখন আমাদের দেশে সঞ্চয়ের মূল্য দিনপ্রতিদিন এত দ্রুত হারে কমছে যে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হারে আজকের একশ টাকার মূল্য পাঁচ-সাত বছর পরে পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াবে। কাজেই ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের মূল্য যদি নাই থাকল তবে বর্তমানে ভোগসংযমের যৌক্তিকতা কি? উপরন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপকরণে বর্তমানে এত বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে যে নৈমিত্তিক প্রয়োজনের দিগন্তও অনেক দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। এর ফলে প্রয়োজনীয় ভোগের পর উদ্বৃত্ত থাকছেও কম। সুতরাং ভোগতৃপ্তি ও সংযম অর্থাৎ ব্যয় ও সঞ্চয়ের মূল্য এই দুই-এর মধ্যে কোনটিকে কি পরিমাণে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে তা নির্ধারণে আমরা বিভ্রান্ত।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভেবে এসেছি যে সমাজে আয় এবং প্রতিষ্ঠা প্রতিভা ও পরিশ্রমজাত গুণগত উৎকর্ষের ফল। কিন্তু বর্তমানে এসবের জন্য যা প্রথম প্রয়োজন তা হল প্রচার। উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাই একটি বিশ বছরের সিনেমা অভিনেত্রী একবছরে যা আয় করে তা কোনো প্রথমশ্রেণীর প্রতিভার বিশবছরের একাগ্র সাধনার পরও বিস্ময়কর। না, এই আয় নৈপুণ্য, দক্ষতা, বিশেষ প্রতিভা কি অন্য কোনো গুণগত উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসাবে নয়, এ আয় প্রচারের অভূতপূর্ব বিভ্রান্তিসৃষ্টির বিরাট আয়োজনের ফল। শুধু আয়ের ক্ষেত্রেই নয়, আর আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ঐ

একই কথা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন-পদ্ধতির পুরো কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে প্রচারের প্রচেষ্টার ওপর। মন্ত্রী হতে গেলেই কি আর ভাল লেখক হিসাবে সুনাম কিনতে গেলেই কি প্রচার দেবতার পুজোর ডালি সাজাতে হবে সর্বাগ্রে। কাজেই গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্যে পরিশ্রম আর প্রচারের জন্যে পরিশ্রম এই দুই মূল্যের কোন্‌টিকে কি পরিমাণ অগ্রাধিকার দেব সে বিষয়ে আমরা বিভ্রান্ত।

কোনো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টির আর একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞানের অভাবনীয় দ্রুত হারে উন্নতি। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের কাজে স্বয়ংচালিত যন্ত্রের প্রসার ঘটেছে অতি দ্রুত হারে যার ফলে আমাদের দক্ষতার মূল্য সম্বন্ধে আমরা হতচকিত। দুএকটি দৃষ্টান্ত এই ধারণাকে স্পষ্টতর করতে পারে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিতে কয়েক লক্ষ লোক হিসাবনিকাশের কাজে নিযুক্ত আছে। এঁদের কাজ অনেক বছরের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমজাত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখন এইরকম একশজনের একবছরের কাজ একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এক ঘণ্টায় আরো একশগুণ নির্ভুলভাবে করে দিতে পারে। উৎপাদন বাড়াতে গেলে এইসব যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে এবং সেই সঙ্গে এই কয়েক লক্ষ লোকের এতবছরের কষ্টার্জিত দক্ষতার মূল্যকে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দেওয়া হবে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এইসব কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেকারত্বের জন্যে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে তাহলেও তো তাঁদের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতার স্বীকৃতি দেওয়া হল না। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইসব স্বয়ংচালিত যন্ত্র চালানোর জন্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা শুধু যে অতিমাত্রায় কম তাই নয় তাঁদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাও খুব স্বল্পায়াস অর্জিত। যে কোনো একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্র কয়েকমাসের ট্রেনিং নিয়ে বেশীরভাগ আধুনিক কারখানাগুলির বড় বড় বিভাগ মাত্র কয়েকটি বোতাম টিপে চালাতে পারেন। স্বয়ংচালিত যন্ত্রের অভাবে সেখানে হয়ত বহুহাজার লোকের বহুবছরের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হত। সুতরাং একদিকে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ও অন্যদিকে প্রচারের অভূতপূর্ব সাফল্য এই দুইএর মাঝখানে পড়ে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মূল্য যে কি পরিমাণ অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ধারণে আমরা অক্ষম।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যকে আমরা চিরকাল সর্বাগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি। কিন্তু গত তিরিশ বছরের নানারকম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা বিচার করে আজকের বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত যে অনুন্নত দেশগুলিকে দ্রুত এবং স্বয়ং-সম্প্রসারিত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে

বেশ কিছু পরিমাণে খর্ব করতেই হবে। শুধু অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেই নয়, উন্নত দেশগুলিতেও যদি উন্নয়নের গতিবেগ সমতালে রাখতে হয় তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন প্রশ্ন হল,—ব্যক্তিস্বাধীনতা কতখানি খর্ব করা যেতে পারে? দেখা গেছে অনুন্নত দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিশেষ স্তরে যত বাড়বে পুঁজিবাদীদের পথ ধরে দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের হার তত কমবে। এক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের হার এই দুইএর কোনটিকে কতখানি মূল্য দিয়ে অগ্রাধিকার বিবেচনা করব সে বিষয়ে আমরা বিমূঢ়।

এতদিন পর্যন্ত আমরা শিশুহত্যা তথা ভ্রূণহত্যাকে নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করে এসেছি। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক চাপে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচেষ্টাকে শুভ বলে স্বীকার করতে আজ সকলেই একমত। অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ এবং ভ্রূণহত্যার মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা এতই সূক্ষ্ম যে আমাদের দৃষ্টিক্ষমতার আওতায় আসে না। এমন কি জাপানী প্রথায় জন্মনিরোধকল্পে ভ্রূণহত্যাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের দেশে হয়েছে ও হচ্ছে। এখানে আমরা না পারি প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে আর সেইসঙ্গে না পারি তার অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে সহজে স্বীকার করতে। আমরা বিমূঢ়। এই প্রসঙ্গে আর একটি আশঙ্কা তেমন স্পষ্ট না হলেও কালো ছায়ার মত সামনে এসে দাঁড়ায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজননের উৎকর্ষ বিধান ঘটেছে অতিমাত্রায় এবং মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য পশ্চিম দেশগুলিতে এই পদ্ধতিগুলির প্রসারও ঘটেছে অল্পবিস্তর। আমাদের দেশে এই পদ্ধতির প্রসারের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া অবাস্তব হবে। এবং এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে যৌনজীবনে নৈতিক মূল্যের এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে যাতে বিভ্রান্তি আসা অবশ্যম্ভাবী।

এরকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যেতে পারে।

এভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের দেশে বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিত্য অনুভূত মূল্যগুলির একান্ত ব্যক্তিগত মূল্যায়নেও আমরা সক্ষম নই। অর্থাৎ কোনো কাজে কোন্ মূল্যের কতখানি অর্জন করা গেল বা কি বর্জন করতে হল তা নির্ধারণে আমরা অক্ষম। সুতরাং যখন কোনো কাজে আমরা কি পাব আর কি পাব না, কি দেব আর দিব না তার হিসাবনিকাশ করতে পারছি না তখন সে কাজের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতাও আমাদের নেই। আবার কোনো মূল্যকে যখন ভালমন্দর বিচারে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিমিত করতে পারছি না তখন কোন্ পথ

দিয়ে যে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছব তা নির্বাচনের ক্ষমতাও আমাদের থাকছে না, অর্থাৎ পথের জটিলতায় আমরা পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

পথই যখন খুঁজে পেলাম না তখন নির্বাচিত পথে চলার বা চালানোর ইচ্ছার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

জনশ্রুতি এই যে আমরা নাকি কোনো সামাজিক মূল্যকে আশ্রয় করে চলছি না, আমাদের সামনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা নাকি সচেতন নই, কিংবা হয়ত সামনে কেবল পশ্চিমী সভ্যতার পোড়ো জমির আতঙ্ক দেখে বিহ্বল হয়েছি। অবস্থা নাকি নিতান্তই অস্বাভাবিক এবং অদূর অন্তে নাকি আমাদের ধ্বংস বা পতন অনিবার্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনা হতে আমরা অন্য সিদ্ধান্তে আসতে পারি। বর্তমানে আমরা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যকে আশ্রয় করিনি তার কারণ এই নয় যে আমাদের সামনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই কি সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলার ইচ্ছা নেই, কিংবা একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনিবার্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি। লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই লক্ষ্যের সামাজিক মূল্যগুলিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা এমন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক প্রতিবেশের বিরুদ্ধ সংঘাতময় যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি যেখানে সেই মূল্যগুলির অগ্রাধিকার বিচারে আমরা বিভ্রান্ত। এবং এই বিভ্রান্তি সাময়িক নয় এরকম কোনো সিদ্ধান্তে আসার কোনো যৌক্তিকতা দেখা যায় না। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগসন্ধিতে এরকম বিভ্রান্তি আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনিই স্বাভাবিক তার স্বল্পক্ষণস্থিতি। সুতরাং কিছু প্রতীক্ষার পর বিভ্রান্তির কুয়াশা কেটে গেলে আমরা আবার নতুন পথের দৃঢ় দিশারী সূর্যকে খুঁজে পাবই এ বিশ্বাস জোর করে দূরে ঠেলার মত কোনো যুক্তি চোখে পড়ে না।

সবশেষে, সবচেয়ে গোড়াকার একটা প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। তা হল মানব প্রকৃতিতে আদৌ কোনো মূল্যের অস্তিত্ব সম্ভব কি না। আধুনিক অস্তিত্ববাদ এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে, সন্দেহবাদ সন্দেহ করে। সেখানে বড় কথা হল : আপাততঃ এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে, আমি তো আছি বেঁচে। কিন্তু ঐ যুক্তি এড়িয়ে যাওয়ার যুক্তি হল—এই বেঁচে থাকার জন্যেই মূল্যকে আবিষ্কার করতে হবে। মানুষ ক্ষণকালের জন্যে নয়—সে নিত্যকালের। সে শুধু আছে নয়, সে থাকবে। সে থাকবে বলেই তাকে বাঁচার মূল্য দিতে হবে। শুধু বাঁচার নয়, বাঁচানোরও। কারণ সে একা বাঁচবে না, অনেককে নিয়ে বাঁচবে। বাঁচার মত বাঁচবে—পশুর স্তরে নয়, মানুষের স্তরে। এই বাঁচা আর বাঁচানোর মূল্য তাকে দিতেই হবে। তাই অন্ততঃ এই মূল্য দেওয়ার মূল্যবোধকে তাকে আবিষ্কার করতেই হবে। আমাদের বাঁচার আর বাঁচানোর মূল্য দিতে হবে এই বোধের মধ্য দিয়েই আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের প্রথম পরিচয় হোক।

মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসু

আনন্দময় সেন

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতি যুবক রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে সে তীব্র শ্লেষ নিপুণ সমালোচনা ক'রেছিলেন তার থেকে এই প্রমান পাওয়া যায়। পরে (৪৬ বৎসর বয়সে) আবার রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ঠিক পূর্ববর্তী প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে অস্বীকার কোরে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রশংসা করেছেন এবং তা সংক্ষিপ্ত হলেও সেই প্রবন্ধের মধ্যে সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের শিল্প সৌন্দর্যের পরিচয় যথার্থ উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। যৌবনে 'ভারতী'তে মেঘনাদ-বধ কাব্যের মূল সমালোচনার বক্তব্য ছিল এই যে মেঘনাদবধ কাব্য পুরোপুরি অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, ওর মধ্যে কবিত্বের কিছুই নেই। প্রথমে মেঘনাদবধ কাব্যের সামগ্রিক ত্রুটির আলোচনা এবং পরে প্রত্যেক সর্গের দোষত্রুটি দেখিয়ে তবে যুবক রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হয়েছেন। দোষত্রুটি দেখালেই যে কোন জিনিষ শিল্প মূল্যের মাপকাঠিতে নিকৃষ্ট এবং পরিত্যজ্য তা স্বীকার করা যায় না। বিচার বিশ্লেষণ এবং আলোচনার মধ্যে গ্রহণযোগ্য যথেষ্ট যুক্তি থাকা প্রয়োজন। আর কাব্যের ক্ষেত্রে ত অন্য কথা, কারণ সেখানে রসের বিচারে সমালোচকের উক্তি সর্বশেষ এবং সার্বোৎকৃষ্ট কথা নয়। পাঠকের আপন অনুভূতি, তার নিজস্ব চিন্তাধারা এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা—এই সমস্তই রসসৃষ্টির আশ্রয়।

'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' আদিঅন্তে একেবারে মৃত, আমাদের প্রাণে কোন সাড়া জোগায় না, হৃদয়ে কোন আন্দোলন তোলে না। সমগ্র কাব্যটি যেন ছাঁচে ঢালা, কলে তোলা, নির্দোষ, নিষ্প্রাণ সামগ্রী। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পড়ার পর 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কোন রসিক পাঠকই সানন্দে গ্রহণ করেন না। 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আর যাহাই থাকুক যথার্থ কোন শিল্প বিচার নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন—'ভারতী'তে যে প্রবন্ধ বেরোয় সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল না, প্রবন্ধে শেষে ছিল 'ভ', সে 'ভ' ভানুসিংহের 'ভ' হোতে পারে বা ভয়ের 'ভ' হোতে পারে। আসল কথা যে ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা ও সাহস যথেষ্ট ছিল না। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজের পূর্ববর্তী আলোচনার মূল্যহীনতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হ'য়েছেন। "মেঘনাদবধ কাব্য, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও

রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যের রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ, ইন্দ্রজিত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। সে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো এবং কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বার দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া যাইতেছে। সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্‌কার দিয়া কাঁদিতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

রবীন্দ্রনাথ এও স্বীকার করেছেন যে, যৌবনেকৃত মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা একটা খেয়ালী ব্যাপার, তার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই, কেবল একটা পরখ করে দেখার চেষ্টা মাত্র এবং তা অবৈজ্ঞানিক ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে। কবির নিজের উক্তি এই যে বাচ্চা হরিণের শিং বাহির হোলে সে যেমন গুঁতোগুঁতি করে সবকিছুই দেখতে চায়, তেমনি মধুসূদনের অমরকাব্য 'মেঘনাদবধে'র উপর নখরাঘাত করে তিনি সাহিত্যিক সমালোচনা শুরু করেন।

স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে আসে যে এত কাব্য থাকতে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ কাব্য নিয়ে এরূপ সমালোচনা আরম্ভ করলেন কেন, তার কারণ বলা যেতে পারে যদিও তা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। কিশোর বয়সে পাঠগ্রহণ কালে রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষক মেঘনাদবধ কাব্যের অলংকারই শিখিয়েছেন। কাব্যের কাহিনী, তার শিল্পগত দিক না পেয়ে শুধু জটিল দুরূহ অলংকার তত্ত্ব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটা বিরূপতা স্থান পেয়েছিল। কিশোর মানুষের তরুণ চিত্তে যে আঘাত লাগে এবং ফলে যে বিরূপতার

সৃষ্টি হয় তাহা পরিণত বয়স পর্যন্ত থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন বিচার, বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের মধ্যে সেই বিরূপতা মাঝে মাঝে ঈষৎ জেগে ওঠে। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, কিন্তু একেবারে অযথার্থ নয়। ছন্দ সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্যকে দলবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করার রূপটি স্মরণীয়।

যাহাহউক মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধের ('ভারতী'তে প্রকাশিত) ভুল স্বীকৃতিও বটে এবং তাহা মেঘনাদ কাব্যের সংক্ষেপে সামগ্রিক শিল্পমূল্যের নির্ধারণ।

বুদ্ধদেব বসু কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতীযুগের প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকেই মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে যথার্থ আলোচনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। বসু মহাশয় বলেছেন, "ঐ প্রবন্ধের চিন্তা বিন্যাসে অপরিণত মনের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎসত্বেও যে সত্য কথাই বলা হ'য়েছিল তাতে সন্দেহ নাই", এবং আরও বলেছেন, "অথচ রবীন্দ্রনাথও পরবর্তী জীবনে সে প্রবন্ধ প্রত্যাহরণ করে অন্য কোন সুযোগে মাইকেলের স্তুতি ক'রেছিলেন, বোধ করি পূর্বসুরীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের প্রথা অনুসারে।"

বুদ্ধদেব বসুর মাইকেল সম্পর্কে (দ্রষ্টব্য—মাইকেল প্রবন্ধ—সাহিত্যচর্চা—বু' ব) আলোচনায় মাইকেল সম্পর্কে অসৌজন্যেরই প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসৌজন্যও প্রকাশ করে। বুদ্ধদেব বসুর মতে যৌবনে লিখিত "মেঘনাদবধ" কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাই যথার্থ আলোচনা, কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথ একথা গোপন করেছেন, তার কারণ পাঠক সমাজে মেঘনাদবধ কাব্যের খ্যাতির ও পূর্বসুরীর সৌজন্যে। যে রবীন্দ্রনাথ জীবনে সত্যভাষনে ভয় পেতেন না ("যেন রসনায় সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গ সম"), বুদ্ধদেব বসুর মতে সেই রবীন্দ্রনাথ সত্যকে গোপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই রূঢ় অসৌজন্য মন্তব্য বুদ্ধদেব বসুর অহংকার ও স্পর্দ্ধার পরিচয়। আসলে, ক্লাসিক কাব্যের দৃঢ়সংহতি এবং শিল্প সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মত বুদ্ধদেব বসুর মানসিক প্রস্তুতি নেই। 'মেঘনাদবধ' যে শিল্পের বিচারে যথার্থই কাব্য তার প্রমাণ—বিরুদ্ধ আলোচনা সত্বেও 'মেঘনাদবধ' কাব্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভীষণ, প্রবল ও করুণ মাধুর্যে এ কাব্যের রসসৃষ্টি। মধুসূদন তা জানতেন—

"He who is pure, tender, and pathetic wtth a dash of sublimity is sure to float in triumph in the current of time."

সায়ন্তনী

সুশান্তকুমার সেন

দিনান্তের শেষ স্বর্ণে উদ্ভাসিত সায়াহ্ন-আকাশ
বুদ্ধের চোখের মত সমাহিত স্থির
রক্ত-চন্দনে লিপ্ত বিশাল দ্রাবিড় যেন
প্রার্থনায় নতজানু মহাকাল মন্দিরের মাঝে।
আগন্তুক আঁধারের শব্দহীন পাখোয়াজ বাজে—
দীর্ঘ ঋজু শালের পল্লবে,
নিঃসঙ্গ ঝিল্লীর রবে কালের মন্দিরা।
ঝর ঝর ঝরে
দগ্ধ দীর্ণ নীলকণ্ঠ মনের প্রান্তরে
শান্তির আকাশ-গঙ্গা।
সহসা সিন্ধুর স্বাদে ভ'রে ওঠে পল্বল হৃদয়,
চূর্ণ-স্বর্ণে মনিময় জ্যোতির্বিদ্ধ আকাশের তলে
আশ্চর্য আলোতে এক জাতিস্মর চেতনার গৌরীশৃঙ্গ জ্বলে।
আত্মার অঙ্গারে দগ্ধ যন্ত্রণার সুরভিত ধূপ
নক্ষত্রের ছায়াপথে অবাধে উধাও।
নির্বাক নিশ্চুপ রক্তের ঘনিষ্ঠ কান্না
ধূলায় চন্দন-গন্ধ-স্নায়ুর সেতারে বাজে সায়ন্তনী সমুদ্রের সুর,
মনের ফাটলে গুপ্ত ক্রুদ্ধ শঙ্খচূড়
করুণায় ম্লান হয়ে আসে।

বুদ্ধির শাণিত রৌদ্রে বর্ষণের আকাঙ্ক্ষারা বিন্দু বিন্দু জমে,
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদ মিশে গেছে এক শুদ্ধ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।

—o—

স্বপ্ন, শপথ এবং

সিরাজুদ্দীন আহমেদ

সাতটি তারার গান এক মুঠো ঘাস
আর ফেনিল আকাশ নিয়ে ঋজু মাস্তুল।

দরজার চৌকাঠে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা আবর্তিত হয়
একদিন এইখানে ফুলগন্ধ প্রজাপতি
একদিন এইখানে অজানা মনের ফুল
একদিন এইখানে সমুদ্র পাহাড় আর অবিশ্বাসী কাঁটাগাছ…

প্রবাসী স্বপন।

ঘুমের সাগর থেকে ভোরের আলোয়
একটি দ্বীপের আশা কুয়াশার বাসা
একটি সবুজ খেত সোনালি ফসল
একটি আকাশনিম…
সদ্যোজাত বৎসকে গাভীর লেহন
আচ্ছন্ন পুলকে মগ্ন সিঁদুর-প্রলাপ।

আকাশনিমের ঘ্রাণ
সাতটি তারার গান একমুঠো ঘাস
খঞ্জ আকাশ নিয়ে জীর্ণ হলুদ।

দরজার চৌকাঠে দয়িতের অপমান আবর্তিত হয়
কোনোদিন এইখানে ফুলগন্ধ প্রজাপতি
কোনোদিন এইখানে অজানা মনের ফুল
কোনোদিন এইখানে সমুদ্রপাহাড় আর
সিঁদুর প্রলাপ…

অব্যক্ত ইন্দ্রিয়েরা অবিশ্বাসী কাঁটাগাছ হয়ে
পুরোণ রোয়াকে বসে উটদের জাবরের সুখাদ্য যোগায়।

—•—

নির্জন মুহূর্তেরা

ব্রততী বিশ্বাস

অন্ধকারের আবরণ থেকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে
মুহূর্তেরা আসে।
আনন্দে, বেদনায়, শান্তিতে নির্লিপ্ত-
স্বচ্ছন্দ আনাগোনা।
তাদের স্পর্ধিত শরীরে অবসাদ,
জীবনের জটিল অন্ধকারে
বিষাদের নিঃসঙ্গ ঘটনায়
তাদের বিক্ষিপ্ত পদচারণা।
প্রতিদিন টিঁকে থাকার অসহ্যযন্ত্রণা
তারাই নিয়ে আসে—
কাঁধে বহন করে নিয়ে আসা শবদেহের মতো।
অস্পষ্ট কুয়াশায় ভীত ছায়ার মতো
তাদের উপস্থিতি।
তাদের প্রচ্ছন্ন হাসিতে গাঢ় অন্ধকারের অবলেপন।
তাদের নির্বিকার ইঙ্গিতে আমার অসহায় সমাধি
নিস্তব্ধ মৃত্যুর মতো।

—০—

খোয়াই

শ্রীঅনিরুদ্ধ মণ্ডল

কাঁচের আকাশ ভেঙে নেমে আসে আলো
বিন্দু হতে বৃত্ত হয়ে মিশে যায় ধ্বনির সবুজে·
চোখ মেলে হেসে ওঠে শিশুধান।

বিষণ্ণ দুপুরে
অজানা পাখী ডাকে অচেনা সুরে।
বারোমাস রৌদ্র ছায়া,
পুনরায় ব্যাপ্তি ফেরে সংকোচনে প্রত্যাশা ব্যর্থতা,
যেন দিনরাত্রিগুলো ধ্বনির আবর্তে রাখে
চিরঞ্জীব স্থিতিস্থাপকতা।

(তবু) আলোর দেয়াল ভেঙে মিশে যায়
যন্ত্রণার দুর্লভ ফসল,
ধ্বনি সব ফিরে যায়—ধ্বনি হয়ে ধ্বনির পাতালে

—০—

ফস্টাস ঃ রেনেশাঁ ঃ নেমেসিস্

Ah, Faustus..... my Christ !
Ah, Pythagoras'......never be found !
Christopher Marlowe

অনুবাদ—শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

হায়, আর একটি ঘণ্টা, ফস্টাস···

তারপরে তোমার নারকীয়বিলুপ্তি···

অনন্ত কালের মত।

গ্রহ উপগ্রহ সব

তোমাদের চির ঘূর্ণন স্তব্ধ হোক,

সময়-পাখীরা কেন বন্ধ করেনা পাখা ?

ওগো, মধ্য রাত্রি যেন কখনো না আসে !

সূর্য জাগো জাগো

রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবী যেন মৃত্যুহীন হয়···

অথবা

(দোহাই তোমাদের)

এই মুহূর্তটিকে

একটি বছর মাস-সপ্তাহ,

কি অন্তত একটি সুস্থ দিনে

বদলে দাও—

আমি যেন কাঁদবার সময় পাই,

আমি যেন পাই,

আত্মার রক্ত-ক্ষরণ রোধ করার একটু

মুখোমুখি অবসর

'হে রাত্রি, তোমার অশ্ব-গতি

কি একটু শ্লথ করবে না ?'

(হায়) তবু নক্ষত্র স্পন্দিত হচ্ছে···

ছুটছে সময়...

ঘড়ির মরণ-সঙ্কেত আসন্ন

শয়তান এসে যে নিয়ে যাবে আমাকে !

না না, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব আমার ঈশ্বরের কোলে!
(কিন্তু কে টানে পিছনে ?)—
দেখ, দেখ, অন্তরীক্ষে যিশুর রক্ত-ধারা···
ওর এক বিন্দু আমার আত্মাকে বাঁচাতে পারে—
শুধু অর্ধ বিন্দু মরি মরি! যিশু! যিশু!

*   *   *

(আহা) যদি সত্য হ'ত পিথাগোরাসের জন্মান্তর বাদ,
যদি শরীর-খাঁচা ছেড়ে
উড়ে যেত আত্মা-পাখী,
আর—আমার রূপান্তর যদি হ'ত বন্য পশুতে!
পশুরা কেমন সুখী—
পঞ্চভুতে তাদের ত্বরিত মোক্ষ।
কিন্তু নারক যন্ত্রনা ফস্টাস,
এ শুধু তোমার আত্মার।
ফস্টাস, তুমি অভিসম্পাত দাও
তোমার পিতা মাতাকে,
দাও নিজেকে,
লুসিকারকেও—
যে তোমাকে স্বর্গের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে।
ঐ ঐ···বারোটার সেই সর্বনাশী ইশারা—
শরীর মিলিয়ে যাও হাওয়ায়—
লুসিকার এল বলে,
নিয়ে যাবে নরকে।
(বজ্র গর্জন বিদ্যুৎ-ঝলসানি···
প্রকৃতি, মানুষ, শয়তান)
হে আত্মা, এবার জল-কনায় বিলীন হও,
ঝ'রে পড়
গলে পড়,
সমুদ্রে হোক তোমার নির্বাণ চিরমুক্তি!

—*—

দুটি কবিতা

ভক্তপদ সিংহ রায়

(১)

ফাঁকি

সময়কে মুঠোয় ধরে
রাখবার কী আপ্রাণ চেষ্টা,
কত মিটার দৌড়-পাল্লা
দেব এই সময়ের সঙ্গে!
কখন দেখি,
হাতের মুঠো আলগা,
অনেক পিছনে পড়ে গেছি,
সময় আমাকে দিল ফাঁকি—
আমি সময়কে।
এ এক লুকোচুরি খেলা।

(২)

হেসে উঠি

এখন বড় নিঃশব্দ আর
বিষণ্ণ মনে হয়,
তার চেয়ে এসো আমরা
অতর্কিতে হেসে উঠি—
বাইরে শিশির ঝরে
টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্,
কচি ফুলগুলো
হেসে উঠছে।
এখন বেঁচে থাকার সময়
এসো আমরা বাইরে যাই,
বাইরে এখন শিশির ঝরে
টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্

—*—

একটি উৎসব ঃ একটি চিন্তা

শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

গেরুয়া রাঙা পথ
পথে পথে দোল
দোলায় দোলায় প্রাণ মাতাল।
ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে তার।

"আবীর, আবীর, শুধু একমুঠো আবীর"
বলে চিৎকার করছে আবাল বৃদ্ধ বণিতার দল,
ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে তার।

এমন দিনে
মনের কোণে,
যদি শুনি ভয়ংকর আর্তনাদ
"আগুন, আগুন, শুধু একমুঠো আগুন দাও প্রভু!
আর কিছু গাঢ় অন্ধকার।"
ইতিহাস রবে কি সাক্ষী তার?

—০—

কোন এক বিকেলে

বিজয়কুমার দেববর্মণ

কোন এক বিকেলে
হ্রদের ঝিল্‌মিল্‌ জলে
উজ্জ্বল গোলাপী রঙে
সোনালী সূর্যের রেখাধরে
বহুদূরে—
মিশে যাওয়া নিটোল শরীর
ক্রমশঃ দীপ্যমান ; নিপুণ শিল্পী এক
লজ্জায় আরক্তিম ফুলের উচ্ছ্বসিত
হৃদয়ের গোপন নীরব কথা
ক্রমশঃ এঁকে যায় সমান্তরাল গতিপথে
কর্মরত কৃষকের মতো ; নিজস্ব প্রচ্ছদ ঢেকে
ফুল্ল ভেসে যাওয়া শস্যের শরীরে
ক্রমাগত সমতল ভূমিতে চলেছে যে নদী
একবার ফিরে দেখো তারে,
বিরাম বিহীন ক্লান্ত প্রাণ এক
নিপুণ পথিক সেজে বাতাসের সাথে
অজানা এক পাখীর মন নিয়ে দূরে
অনেক দূরে······

তারপর—
ক্রমশঃ নিস্তব্ধ ; একখণ্ড নীরবতা
বাতাসে, বুকে, মনে, চতুর্দিকে
নিবিড় সন্ধ্যা নেমে আসে
ধূসর কাজল চোখে মেঘের শিবিরে,
অন্ধকারে, পেঁচার অনর্গল কলতানে
সবুজ পত্রালীর ভিড়
ক্রমশঃ মুছে গেছে
জীবনের বন্য জলস্রোতে।

—*—

রাত্রি

সুনীলকুমার বণিক

খোলা জানালা :
বাইরে আলো কালো রাত—
ঝির্‌ঝির্‌ হাওয়া
পাতায় পাতায় ডালে ডালে শব্দ।
মনে প্রতিধ্বনি—
কথার চিক, সোনালী ছোঁয়াচ,
মৌনতার দারুণ তপস্যা।
উষ্ণশয্যা,
দীর্ঘশ্বাস।
সজীব ইচ্ছা, মিশ্রিত কল্পনা,
একান্ত অবসাদ,
হাল্কা নিদ্রা।
স্বপ্ন, হাসি, কান্না।

—:•:—

খুকুর চোখে

শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচার্য

রাজকন্যার নূপুর বাজে
রাতের তারার সাথে,
ঐ সুরেতে পাগল হয়ে
ঝরণা যে তাই মাতে ॥

সোনার কাঠি ছোঁয়ায় বালা
সাত সকালে ওঠে,
তারি সঙ্গে সোনার বরণ
সূয্যি মামা ওঠে

লাল সিঁদুরের টিপ পরে তাই
দোপাটি হয় লাল ;
সাঝের বেলা ঘুমায় কন্যা
ঝিঁ ঝি বাজায় তাল ।

কাঁদে যদি সোনার মেয়ে
কালো ভ্রমর চোখে,
মেঘের দেশে পড়বে সাড়া
কাঁদবে সবাই দুখে ।

ঝর ঝর বাদল ধারা
অমনি ঝরে যায় ;
সূর্য কাঁদে, তারা কাঁদে
খুকুও কাঁদে হায় ॥

—•—

নিশ্চেতনা

সদানন্দ কুণ্ডু

খেয়ালী আঁখির অলস চাওয়ায়—
ভেসে যাব, ঝরে যাব, হলুদ পাতার মত
ঘুরে ঘুরে, শূন্যে শূন্যে ফাগুনের ফেরারী হাওয়ায়।
ফুল ঝরে, পাতা ঝরে, গন্ধ ঝরে যায়
ঝরা পাতা মরা ফুলে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
সেখানেও মাথা কোটে শূন্য পরিণাম।
(রিক্ত স্মৃতি নিয়ে শুধু ভরে নাকো মন)
নিশ্চেতনা তুমি কি দেবে না ধরা আমার ধরায় ?

ধূসর মাটির বুকে ফিরে এস নিশ্চেতনা—
ক্ষণিক আত্মার শান্তি ব্যথার সোহাগ,
তোমার গানের সুরে মুছে যায় বেদনার নীল
নির্বাক মুহূর্তগুলি ফিরে পাই হয়ে আনমনা
(তোমার গানের সুরে আমার হৃদয় ওঠে ভ'রে)
তোমার গানের সুরে পাব নাকি সোহাগের ঘ্রাণ ?

—o—

পুজো

শ্রীকিশোরীমোহন দাঁ

১

পলাশপুর মৌজার নায়েব বিপদতারণ রায়। আগে তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। এখন বাঘে গরুতে জল না খেলেও, প্রজাদের ঘোলা জলও খেতে হয়। লোকটা দেখতে ছোটখাট। রংটা ফরসা। সামনের দাঁত দুটো উঁচু উঁচু—চুল কোঁকড়ান, দু গালে ব্রনোর দাগ। বুকটা ঠিক খোলা মাগুর মাছের মাথার মতো। পেটটা শরীরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা। পাগুলো কাঠি কাঠি। সাধারণতঃ বিপদতারণ কাপড় পরে হাঁটু বরাবর, তাও তাতে একটা কোচা। গায়ে তসরের চাদর।

বিপদতারণকে দূর থেকেই চেনা যায়, তার ডান কানে খাগের কলম থাকে, আর একটু কাছে গেলেই বাঁ কানে দেখা যাবে একটা পোড়া বিড়ি। "পশো শোন্" ডাকলেন পলাশপুরের নায়েবমশায় বিপদতারণ রায়। "যে আজ্ঞে বাবু, যেছি"

"বুঝলি, তোকে আজ পালাশপুরে ঢোল পিটুতে হবে—কারণ এখানে কালীপুজো করবো। আর বলিস্ প্রত্যেক ঘর পিছু দুটো ক'রে টাকা আর দুপো করে চাল লাগবে, এখন নি বলে দিয়ে আয়—বুঝলি"

"বাবু, এখন যে ধান উঠে নাই—এখন তো কেউ দিতে পারবেনা"

"বেটাকে জুতিয়ে ঝাল ঝেড়ে দোব, যা বলছি তাই কর্—মুখের উপর মুখ। আর শোন—কেউ যদি কিছু বলে, বলবি নায়েববাবুর আদেশ-দিতে হবে, বুঝলি"—বলেই কড়াই-গণ্ডাই মন দিলেন।

আমাদের নায়েববাবু সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। নায়েববাবুর বাড়ী পাঁচ ক্রোশ দূরের কালিকাপুরে। শোনা যায়—এক বিধবার সঙ্গে মা পাতায়। তাকে ভুলিয়ে তার দুবিঘে জমি নিজের নামে নিয়ে নেয়। তারপর বিক্রী করে দেয়। সে থেকে সে বাপের ত্যাজ্যপুত্র—কারণ বাপ ছিল অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির। তারপর বিপদতারণ মশায় যায় চাকরির খোঁজে লোচনপুরের জমিদারের কাছে জমিদারীর কাজ শিখতে। জমিদার রাধবল্লভবাবু তার বিষয়বুদ্ধি দেখে তাকে দুর্দ্ধর্ষ মৌজা পলাশপুরের নায়েব করে দেন। সেই থেকেই এখানকার নায়েব। পলাশপুর মৌজাটা বেশ বড় না হলেও মন্দ না। আবার পলাশপুর মৌজাটা কতকগুলো গ্রামে ভাগ—বিক্রমপুর, নবগ্রাম, রায়পুর, পলাশপুর। খোদ পলাশপুরে মোট একশ ঘর লোকের বাস। প্রত্যেকেই অবস্থাপন্ন চাষী না হলেও কোনরকমে চলে যায়।

"বাবু, ঢোল দিয়ে এলাম" পশুপতি চৌকিদার বললে।

"কেউ কিছু বল্‌লে রে?"

"গোবিন্দ মোড়ল কিছুই দেবে না বললো।"

"আচ্ছা দেখা যাবে—বেটার খুব বাড় বেড়েছে। তু এখন যা। শোন্, বিকেল বেলায় আসিস্ একটা বস্তা হাতে ক'রে, বুঝলি। আর মাত্তর তিন দিন বাকী আছে—মুত্তি তৈরী করতে দিতে হবে। সন্ধ্যেবেলায় নবগ্রামের ভোলা মিস্ত্রীকে বলে আসবি। তালপাতা জ্বেলে শুকিয়ে নিয়ে মুত্তি করে দেবে। আস্‌বি বুঝলি"।

"যে আজ্ঞে বাবু"—বলে পশুপতি চলে গেল।

নায়েবমশায় ক্ষিদে পেয়েছে বলে, বাড়ীর ভিতর দিকে চলে গেলেন। বাড়ী মানে এই কাছারী বাড়ী। একদিকে সেরেস্তার কাজ চলে—অন্যদিকে তালপাতার আড় দিয়ে থাকেন আমাদের বিপদতারন রায়। আছেন আজ পাঁচ বৎসর। অন্যদের থাকবার দরকার হয় না, কারণ গোমস্তা, লগ্দি এখানকার পাশের গাঁয়ের লোক।

২

ঠিক সন্ধ্যে বেলা। পশুপতি চৌকিদার একটা বস্তা হাতে উপস্থিত হয়েছে। "নায়েব বাবু বাড়ী আছেন?"—এসেই ডাক দিলো পশুপতি।

"বোস্, আমি চললাম বিড়িটা খেয়েই" উত্তর দিলেন নায়েব মশায়।

"চল্। শোন্, আমাদের গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে আদায় করতে হবে—বুঝলি। কারণ এদিক থেকে আদায় করলে গোবিন্দ মোড়লের দেখাদেখি হয়তো অন্যরা দেবে না। আর শোন্—হরিদাসীর একটা ছাগলের পাঁঠা আছে না? ওই পাঁঠাটাকে কালী পুজোর রাত্রে চুরি করে আনবি—তখনি কাটা হয়ে যাবে।

"আপনার আশীর্ব্বাদে সব পারবো"—হাতজোড় ক'রে পশুপতি বললো। "এই তো এসে গেলাম। বেজা বাড়ী আছিস্ রে? দে মায়ের পুজো দে—মা বিপদতারিণী মাগো"—বলেই বিপদতারণ হাত দুটো কপালে ঠেকালেন।

"আজ্ঞে, আসুন নায়েব বাবু" ব্রজেন মোড়ল প্রণাম করলো।

"দে একটা চট-ফট দে, বসি। মা তোদের ভাল করবে রে—মাগোমা" সে একবার আকাশের দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ তোদের টাকা জোগাড় হয়েছে তো। সব মায়ের ইচ্ছা—হবেরে। এবার দে সব দে। কত খরচ পত্তর জানিস্! হ্যাঁ—আর আমি কল্যাণপুরের লেটোর বায়না দিয়েছি—খুব জমবে বুঝলি। মা গো মা" বলেই হাতে তিনবার তুড়ি দিলো।

"বাবু কত কষ্ট করে টাকা জোগাড় কল্লাম। ছোট বাছুরটোকে বিচে টাকা

জোগাড় করেছি। সবাই তো সেই ভাবেই করেছে নায়েববাবু। আমাদের খোকন তো খাবার চাল বিক্রী ক'রে টাকা করেছে। ওর ধান না উঠলে, একবেলা ছাড়া খেতে পাবে না। বাবু এখন পুজো না ক'রে অঘ্রাণ মাসে করতে পারতেন"—বলে ব্রজেন একপাশে দাঁড়ালো।

"বলিস্ কিরে! সব মায়ের ইচ্ছা, মায়ের এগাঁয়ে পুজো লেবার মন হয়েছে এখন। শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভ কাল হরনম্"—মাগো মা। বেজা—তোর কুমড়ো তো বেশ ফলেছে রে! তা দুটো দিয়ে আসিস্। চেখে দেখবো কেমন—মায়ের পুজোতেই লাগবে। দিবি কেমন?

"বাবু, ওই দুটোই তো হয়েছে—আর হয়নি আপনাকে একটোই দোব"

"নারে বেজা দুটোই দিবি। তোর আবার হবে। আর শোন্—তু আর পসো সব আদায় করে আন্। আমি এইখানেই বসি।" বলেই বিপদতারণ চটের উপর বসলেন।

৩

"বাবু, আদায় হয়েছে কেবল আমাদের গোবিন্দ মোড়ল দিলো না। বললে, বাবুদের পুজো আমরা দোব কেনে? ওদের পূজা ওরা করুক।" বলেই ব্রজেন মোড়ল চাল আর টাকার হিসাব দিতে লাগলো।

"হ্যাঁ, বেটার খুব বাড় বেড়েছে। বেটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চলতো 'পশো'।" বিপদতারণ সাত হাত-কাপড়ের কোচাটি হাতে নিয়েই চললেন।

"গোবিন্দ বাড়ী আছিস্। হ্যাঁরে, মায়ের পুজোর চাঁদা দিস্নি কেন? কেনে দিবি না?"

"তোমরা পুজো করবে আর আমরা কেনে টাকা দোব? তোমাদের পুজো তোমরা করো—নিজের টাকা দিয়ে। জোড় করলে গোবিন্দ মোড়ল টাকা দেবে না"—গোবিন্দ একপাশে দাঁড়ালো।

বলতে কি গোবিন্দ মোড়লের অবস্থা সবার চাইতে একটু ভাল। একটা মোষের হাল আর একটা গরুর হাল। মোটা মুটি তার চাষ থেকেই বাড়ীর খরচ পত্তর চলে। আর তার স্বাস্থ্যও ভাল। চওড়া বুক, গাল পাট্টা দাঁড়ি। একবারে না দাঁড়িয়ে এককাঠা জমি কোপাতে পারে। কাজকে সে তোয়াক্কা করে না। বলে "আমি নিজে খেটে খাই, কার তোয়াক্কা করি? আমি কারও গোলাম নই, কেউ আমার গোলাম নই।" মনে কিন্তু সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভয়ে নায়েবের বিরুদ্ধে বলতেও পারে না।

"পারি আদায় ক'রে 'লোবো' "—বলেই বিপদতারণ চলে গেলেন।

"নায়েব বাবু আমি জমিদার বাড়ীতে গেলাম কাল সকালে"

"যা, জমিদার বাবু আমার কিছু করবে না—আমাকে চেনেন"

৪

লোচনপুরের জমিদার বাড়ী। পুরোনো আমলের বাড়ী, কারণ ছোট ইঁট দিয়ে তৈরী। সামনে বসত বাড়ী। একপাশে ঠাকুর বাড়ী আর একপাশে কাছারী বাড়ী। কাছারীর বারান্দায় গোমস্তা—আর জমিদার রাধাকান্তবাবু বসেন। জমিদারদের ধনসম্পত্তি আগেকার মত নাই, কিন্তু রাধাবল্লভ বাবুর প্রতাপ আগেকার থেকেই এককাঠি উপরে।

"তোমার বাড়ী কোথা হে ?" বাজখাঁই গলা দিয়ে রাধাবল্লভ বাবু গোবিন্দকে জিজ্ঞেস্ করলেন।

"আজ্ঞে পলাশপুর" গোবিন্দ মোড়ল জোড়হাতে উত্তর দিলো।

"কি দরকার তোমার ?"

"আজ্ঞে, নায়েববাবু কালীপুজো করছেন। আমাদের প্রত্যেক বাড়ীতে ছটাকা ক'রে চাঁদা চেয়েছে—আর চাল। আমরা গরীব মানুষ এখন টাকা কোথা পাবো বলুন। আর যদি কালীপুজো করতেই হয়—অঘ্রাণ মাসে করলে ভাল হতো। তখন হাতে টাকা আসতো—ধান উঠবার সময় কিনা।"

"তোমার নাম কি হে ?" রাধাবল্লভ বাবু জিজ্ঞেস করলেন

"আজ্ঞে গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল"

"কালী পুজো তো ভাল—একটা পুজো। কি বলো ?"

"হ্যাঁ—তাতো ভালো—কিন্তু এখন না করলেই ভাল হতো"

"বেশ বসো—পরে শুনবো" রাধাবল্লভ বাবু একটা পুরনো খবরের কাগজ যেন মনোযোগ সহকারেই দেখতে লাগলেন।

"রাধাবল্লভ বাবু বাড়ী আছেন ?"

"কে ? ও বিপদতারণ বাবু। আসুন, আসুন। কি ব্যাপার ?"

"কি বলবো,—আমি একটা কালী পুজো করবো ভাবছি পলাশপুরে, কিন্তু—এই গোবিন্দ আর হ'তে দেবে না। সবাইকে চাঁদা দিতে বারণ করে। তা সবাই ওর কথা মানবে কেনে। সবাই হুড় হুড় করে এলে আর দিলে—আমাকে সবাই ভক্তি করে কিনা ! আর এই ব্যাটা দিলে না।"

"আমি কখন সবাইকে নিষেধ করলাম—নায়েব মশায় ?" গোবিন্দ বললো।

"চুপ কর বেটা। গাধা কোথাকার" রাধাবল্লভ বাবু ধমক দিলেন।

"বিপদতারণ বাবু, কালীপুজো কার নামে হচ্ছে ?"

"কেন বাবু—আপনার নামে। আর আপনি যার নামে বলবেন তার নামেই হবে" বিপদতারণ বাবু মুখটা গম্ভীর করলেন।

"না—আমার নামেই হবে। আর শুনুন বিপদতারণ বাবু—কত হবে ?" আস্তে আস্তে নায়েব বাবুর কানের কাছে রাধাবল্লভ বাবু বললেন। "বাবু সত্যি বলছি—একশো টাকা" নায়েব বাবু আরও নিচু গলায় বললেন।

"গোবিন্দ তোমার একশো টাকা জরিমানা। দিয়ে তুমি উঠে যাবে"

"কেন বাবু ?"

"আমার ধর্মে বাধা দিয়েছো না ?"

"যাই—রাধাবল্লভ বাবু—কালীপুজোর ব্যবস্থা করি গা"—রাধাবল্লভের দিকে হেসে গোবিন্দর দিকে কটাক্ষ ক'রে চলে গেলেন।

"টাকা কোথায় পাবো বাবু—কে দেবে ?" বলেই গোবিন্দ মোড়ল কেঁদে ফেললো।

"আমাকে জমি বাধা দাও"।

"তা বেশ বাবু—তাই হোক"।

পরিচয়

শ্রীগুইরাম কুণ্ডু

বেলা গড়িয়ে গেছে, হলুদরং লালচে আভা নিয়ে ছিটিয়ে পড়েছে শ্যামল মাঠের সীমাহারা সীমানায়। নির্জন বনানীর ঝিমিয়ে পড়া রূপের জৌলুস টুকু আবার স্নিগ্ধ আমেজে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে—চাষীরা কাজ করছে মনের আনন্দে। আলুর খেত, গমের খেত, আঁখের খেত বাতাসে দুলছে, সুর তুলছে ছোট পাখী গুলো—কচি সবুজ রংয়ে ডুবে গেছে ক্ষুদে মন গুলো। সোনারোদে কুচকুচে কালো শরীর ডুবিয়ে সবাই কাজে মগ্ন। ওপাশে আলুর গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে মিঠু—সঙ্গে তার মেয়ে চৈতী। বাপ আর মেয়ে।

ছোট্ট সংসার ওদের কোন অভাব অভিযোগ নেই—নেই কোন উচ্চ কামনা বাসনা। জীবনের স্বল্প সঞ্চয় দিয়ে সুখে দুঃখে কাটিয়ে দেবে কোনরূপ, সারা বছর স্বাধীন ভাবে অন্য সকলের মত মাঠে কাজ করে, মহাজনের কাছ থেকে জমি নিয়ে। যা ফসল হয় তার অর্দ্ধেক মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে টানাটানি ভাবে নিজেদের ভরণ পোষণ চালিয়ে নেয়। জীবনের ছেঁড়াফাটা জায়গাগুলোয় তালি দিয়ে কালের সাথে পাফেলে এগিয়ে চলেছে ওরা। কতো বর্ষা বসন্ত কাটিয়েছে মিঠু তার ইয়ত্তা নেই—তখন চৈতী খুব ছোট। কতোই বা বয়স হবে ওর, বড় জোর পাঁচ কি ছয়। কালের সাক্ষী হয়ে অতন্দ্র প্রহরগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে মিঠু সেই ছোট্ট জীবটাকে সে বড়ো করে তুলছে। ভদ্র ঘরের মেয়ের মতোই—তাকে সে মানুষ করতে চেয়েছে তাই জ্ঞান হবার সার্থে সাথে পাঠিয়েছে স্কুলে—কিন্তু তার সে আশা সফল হয়নি। চৈতী তার সে আশা পুর্ণ করতে পারেনি, স্কুল হতে ফিরে এসেছে—"আমার দ্বারা ওসব হবে না বাপি। আমি লেখাপড়া শিখতে পারব না। পণ্ডিত মশাই বলেছে আমার মাথায় কিছু নেই"।

মাত্র মাস কয়েক এখানে এসে বাসা গেড়েছে মিঠু, সকলের সাথে ভালভাবে পরিচয়ও হয়নি। মহাজনের কাছ হতে জমি নেবার জন্যে কতো আকুতি জানিয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে চান না মহাজন—"তোর দ্বারা চাষ হবে না। লাঙ্গল নেই—গরু নেই।

সব আমি করববাবু, আমাকে একটু দয়া করুন"।

সেদিন দু পা জড়িয়ে কেঁদে ছিল মিঠু, বাঁচার প্রয়োজনীয়তা তার কাছে প্রবল। সে নিজে মরে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু ঐ বাচ্চা মেয়েটা, তাকে বাঁচাবে কি করে। তারই জন্য তার ব্যাকুলতা।

মাঠে যেত মিঠু—মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে, গোয়ালাদের কাছ হতে যে দুধটুকু কিনত মাঠ হতে ফিরে এসে তাই দিয়ে তার ক্ষুধা মিটিয়ে রান্না চড়াত। পরম যত্নে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে আবার মাঠে যেত। ফিরত সন্ধ্যায়। তার ফেরার আগে কোনদিন ঘুম

ভাঙেনি, ভাঙলেও লক্ষীমেয়ের মত বিছানায় পড়ে থাকত চৈতী। এই নির্বান্ধব পুরীতে মিঠু ছাড়া আর কেউ নেই যে তার—তাই খেলার সাথী সে পায়নি।

মাঠ হতে ফিরেই দোকান হতে মুড়ি কিনে আনত মিঠু চৈতীর জন্যে। ওকে খেতে দিয়ে রান্না চড়াত, রান্না করতে করতে গল্প বলত—কতো রাজা রাজ পুত্তুর। অবাক চোখে চেয়ে থাকত চৈতী—দুটি ঘন কালো চোখের ডাগর তারায় জাগত শিশুসুলভ কৌতুহল। তারপর আর একটু বড় হতেই স্কুলে পাঠিয়েছে—বড় ঘরের মেয়ের মতোই তাকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছে মিঠু। এই অপরিচিত জগতে চৈতীর সে ছাড়া যে কেউ নেই। চারদিকে শত্রু—ক্ষুদে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চায় তারা। সেদিন বুকে করে প্রাণভয়ে চলে এসেছে মিঠু, যেমন ভাবেই হোক ওকে বড় করে তুলতেই হবে।

—"মিঠু, তুই কথা দে মিঠু, আমার চৈতীকে তুই মানুষ করে তুলবি তুই আজ আমায় কথা দে—আজ হতে তুই ওর ভার গ্রহণ করলি"।

নীরব ব্যথা ভরা দুটি সজল চোখ মেলে চেয়েছিল মিঠু।

শীতের স্পর্শে পাতা ঝরে গেছে গাছগুলোর—শ্যাম সজীবতা শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সূর্যের মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, সেদিন বেলা শেষে ঝরে যাওয়া ফুলের মতন ঝরে গেছে একটা জীবন। অনেক কিছু বলার ছিল, বলা হয়নি—অনাথা হয়ে সেদিন বের হয় সে।

—বাপি! বেলা গেল, চল বাড়ী যাই।

চৈতীর ডাকে চোখ তুলে মিঠু ঘাড় নেড়ে জানায়—চল।

সন্ধ্যার আবছা আঁধারে ঘরে ফিরে আসে ওরা। ক্ষুদ্র একখানা কুটীর, আকাশ জোড়া প্রশান্তির এক টুকরো এসে পৌঁচেছে তাদের গোবর নিকানো তকৃতকে আঙিনায়। শান্ত মধুর সুরে ভরে ওঠে গৃহ কোণ। প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলসী তলায় এগিয়ে যায় চৈতী ; গলায় আঁচল জড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানায়, জানায় জীবনের চরম আকুতি ভেজা প্রার্থনা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে মিঠু, মুখের উপর ঘনিয়ে এসেছে চিন্তার কতকগুলো ঘন কালো রেখা। সে যেন থৈ পায় না। বড়ো ভাবনা আজ চৈতীকে নিয়ে, নিটোল দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে ফুটে উঠেছে যৌবনের পূর্ণ দীপ্তি—

আজও সে ভুলতে পারে নি একজনের বিদায় মুহূর্তের কথাগুলো। অনেক কর্মে সে বড়ো করে তুলেছে—কিন্তু মূল কাজটাই বাকি। যেমন ভাবেই হোক তাকে একাজ পূর্ণ করতেই হবে। মহাচিন্তায় পড়েছে মিঠু—কি করবে সে, ভেবে পায় না। অনেক রাতে খাওয়া দাওয়ার পর কথাটা বলে ফেলে।

চৈতী আজ একটা তোকে কথা বলব।

—কি কথা বাপি ! অবাক চোখে তাকায় চৈতী ।

—তুই আমার মেয়ে নস্ ।

—নই ! যেন আকাশ থেকে পড়ছে চৈতী । অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে উঠে—তবে কে ? কে আমি ?

খুব কম বয়সে অনাথা অবস্থায় ঘর ছেড়ে চলে এসেছে মিঠু, বাল্যেই বাপহারা। জন্মের পর তার মা মারা গেছে। ট্রেন থেকে নেমে পুটুলীটা বগলে জড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় চলতে থাকে। ছন্নছাড়া নিসঙ্গ এক জীবন। তিন দিন কেবল জল খেয়ে কাটিয়েছে, কাজের সন্ধান করেছে বাসায় বাসায়। কেউ দয়া দেখায় নি। রাস্তায় বসে ধুকছিল—চোখের জল এসেছিল শুকিয়ে। হতাশভাবে উদাস চাউনি মেলে চেয়ে ছিল কেবল। —"তুমি এখানে এমন করে বসে আছো কেন বাবা! মনে হচ্ছে কিছু খাওনি" ?

কথা শুনে চোখ ফেরায় মিঠু ঘাড় নেড়ে জানায় সত্যিই সে কিছু খেতে পারনি।

—আমাকে একটা চাকরী যোগাড় করে দিতে পারেন।

সেদিন তাকে তাঁর আশ্রয় দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর সংসারে লোক ছিল খুব কম। তিনি নিজে, একছেলে আর একটা ঝি। ছেলের নাম বাবলু—মিঠুরই বয়সী বড় ভাল লেগেছিল তাকে মিঠুর

কাজ তাকে সামান্যই করতে হত, বাকী সময়টা কাটে বাবলুর সাথে। বাবলু তাকে লেখা পড়া শেখাত। সময় মত বাবলুর বিয়ে দিয়ে বাবলুর বাবা আনালেন এক টুকটুকে বৌ। ডাক্তার হয়ে ছেলেকেও ডাক্তার করে গড়ে তুলেছেন,—কতো আশা বাবলুকে ফরেন পাঠাবেন। কিন্তু বিয়ের বছর দুই যেতে না যেতেই বাবলুকে বিদায় নিতে হল এ জগৎ থেকে। তখন চৈতী তার মায়ের পেটে। মানুষের ভাগ্যই বোধহয় তার জন্য দায়ী—তার জন্মের পর তার মাকেও হারাল চৈতী। বাপ মা হারা মেয়ে। বড় আঘাত পেলেন ডাক্তারবাবু—ছোট্ট নাতনীটির দিকে চেয়ে কেঁদে উঠলেন হু-হু-করে। চৈতীর বয়স যখন দুবছর, একদিন রোগী দেখে অসুখ নিয়ে বাড়ী ফিরে সেই যে শয্যা নিলেন তার পর আর ওঠেন নি। সারারাত বিছানার পাশে বসেছিল মিঠু, ভোরবেলায় চোখ দুটোয় একটু ঘুম জড়িয়ে এসেছিল, বাবুর ডাক কানে যেতেই চমকে উঠে।

মিঠু মিঠু—

সামনে এগিয়ে যায় মিঠু, দুটো হাত জড়িয়ে ধরে ডাক্তার বাবু বলে ওঠে আমি আর বাঁচবো না মিঠু—কিন্তু মরতে আমার বড্ডো ভয়···

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে চৈতী। অনেকটা এগিয়ে এসে পিছন পানে তাকাতে গিয়ে আজ সে ঠোক্কর খায়। সে এক ডাক্তারের মেয়ে—তার দাদুও একজন ডাক্তার ভাবতে গিয়ে চমক লাগে।

—আমি ভাবছি চৈতী তোর বিয়ে কি করে দেবো।

কথা কইল না চৈতী।—চুপ করে ঘর হতে বের হয়ে যায়।

বুক জোড়া কান্নার ভারে নীচু হয়ে যেতে চায় সে। মনের মাঝে বারবার প্রশ্ন উঠে কেন তার কাছে এই পরিচয় প্রকাশ করা, কি প্রয়োজন ছিল এসবের। আজ তার জীবনের কোন মূল্য নেই, সমস্তই হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন আগে। আজ আর কোন পরিচয় নেই তার—অজানার অন্ধকারে সমস্তই আচ্ছন্ন।

সকালে পাখীর চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেছে মিঠুর। বিছানা ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসে। গাছ গাছালির মাথায় এখনও আঁধার জমাট বেঁধে রয়েছে। অবাধ মুক্ত প্রান্তরে চাপ চাপ পেঁজা তুলার মত কুয়াশা জমেছে। শ্যামল ঘাসের স্নিগ্ধ সজীব আমেজটুকু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। রূপোবিন্দুর মতো ঝিকৃঝিক্ করছে জলকণাগুলো। চারিদিক তখন ফর্সা।

চেতী—চৈতী!

পাশের ঘরের দোরটার সামনে গিয়ে থমকে যায় মিঠু; ঘরটা শূন্য, মেঝের উপর খালি বিছানাটা পড়ে রয়েছে। আকুল স্বরে চীৎকার করে ডাকে চৈতী চৈতী! কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে—তার ধারণা চৈতী হয়তো কোথাও গিয়েছে, এখুনি আসবে। কিন্তু সত্যিই কি আর আসবে চৈতী? জীবনের সত্যি পরিচয় পেয়ে মিঠুর কাছে সত্যিই কি সে ফিরবে?

সম্রাট

শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কড়িকাঠ থেকে অদ্ভুত চোখে চেয়েছিলো টিক কিটা।

একমিনিট-পাঁচমিনিট-আধঘণ্টা তারপর এক ঘণ্টা পর্যন্ত। নড়চড় নেই। কী আশ্চর্যভাবে একভাবে চোখ মেলে চেয়ে আছে উপর থেকে নিচে। কি করে এমনভাবে নিঃসাড়ে একটা প্রাণ খুলে থাকতে পারে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। আর কি রকম বিশ্রী দেখতে। সাপের গায়ের রংএর মত ভীষণ ভয়ঙ্কর মনে হয়। এত বড় টিকটিকি—এক ফুটের মত লম্বা বেশ শক্ত সমর্থ একটা জীব কি করে টালির ছাদের কড়িকাঠ ধরে ঝুলে থাকতে পারে—ভাবলো শঙ্কর—কি করে মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিঃসাড়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে? ও পড়ে যায় না কেন? গায়ে যেন ডোরা ডোরা কাটা দাগ একি সাপের গায়ে কিংবা হিংস্র কোন প্রাণীর গায়ে দেখেছে শঙ্কর কোন দিন? হলে সাপের কথাটা চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় কেন? সাপ—অবিকল একটা বিষাক্ত প্রাণীর মত দেখতে।

শঙ্কর উবু হয়ে শুয়েছিল ভাঙ্গা চৌকিটায়। একটা অপরিচ্ছন্ন বালিশ তার বুকের কাছে চাপা পড়ে আছে। ছারপোকার ডিমভরা তোষোকটা চাদর সরে গিয়ে উঁকি দিয়েছে। কি বিশ্রী দাগ তোষকটায়—ছারপোকা টিপে টিপে হত্যা করা রক্তে। যেন মনে হয় খোসপাঁচড়ার দাগ লেগে আছে। তেতলায় ছাদের উপর এক চিলতে কোঠা। দাড়ালে ঘরের চাল মাথা ছুঁয়ে যায় প্রায়। টালির ছাত। শঙ্কর কতদিন একটা উপমা দিতে চেয়েছে ঘরটার। কার সঙ্গে তুলনা করা যায়? হ্যাঁ—একটা দেয়াশলাই বাক্সের সঙ্গে। শঙ্কর গল্প লেখে। শঙ্কর নিজেকে ক্ষমা করল—অন্তত দেয়াশলাই বাক্সের একটু অপমান করল বলে আজ।

হোটেলের এ ঘরটায়ই না কি সবচেয়ে বেশি হাওয়া আসে, ম্যানেজার প্রথম দিন তাকে বলেছিলেন। যখন এই চৌকিটা খালি হয়েছিল। বলেছিলেন, চমৎকার কোঠা মশাই, দেখুন—একেবারে চারদিকে জানালা।

'কেমন, তাই না? সব জানালা, দেয়ালটা অবশ্য টিনের। ছাতটা টালির—' শঙ্কর কেমন একটা ভাপ্‌সা গন্ধ অনুভব করেছিল। ম্যানেজার বলেছিলেন 'ও কিছু নয় মশায়, মানে জানলা দরজা কিছুটা বন্ধ থাকলে ভেতরে একটু গন্ধ হয়।'

'কিন্তু টালি, টালি যে মশায় মাথায় লাগে'—

'হেঁ-হেঁ। তা, একটু তো হবেই, নইলে পঞ্চান্নটাকায় হ্যারিসন রোডের উপর এমন চমৎকার একটি ডাবল সীটের রুম কি পাওয়া যেত মশায়?' 'তা ঠিক' মনে মনে

ভেবেছিল শঙ্কর। কবে একদিন রুমটাকে দেখতে এসেছিল সে, যদি মনের মতো হয় তাহলে থেকে যাবে এই ছিল বাসনা। মনের মতো ত হয়েও ছিল। টাকা জমা দেবার আগে একটু কিন্তু কিন্তু করে বলে ফেলেছিল শঙ্কর কবে একদিন :

'টালির ঘর, টিনের দেয়াল, মাথা ঠেকা চাল। এ কি পঞ্চান্ন টাকা খুব বেশি হচ্ছে না?'

'কিছু না মশায়। ও কিছুদিন থাকতে থাকতেই দেখবেন কম মনে হচ্ছে।' 'কিন্তু টিনের ঘরে আর টালির তেতে-ওঠা গরমে গ্রীষ্মকালে কি হবে?'

'কি আর হবে,' ম্যানেজার টাকা গুনছিলেন সেদিন : 'দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে। মশায়, পৃথিবীতে একটি কথাই ঠিক, আর তা হলো সব ঠিক হয়ে যাবে।' ম্যানেজার টাকা নিয়ে প্রথম রিসিট দিচ্ছিলো :

তাছাড়া, গ্রীষ্মকাল? গ্রীষ্মকালে তো চিন্তাই নেই, অপিসে থাকবেন। হয় সেখানে ফ্যান থাকবে অথবা এয়ারকণ্ডিশন।' চোখ নিচুতে এনে বলেছিলেন : 'আপনার বোধ হয় ফ্যানের অফিস কি বলেন স্যার?'

ম্যানেজার অনুকূল দেব চেয়েছিলেন উত্তরের নিরর্থক প্রত্যাশায়। বেকার শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় সে কথা যেন শুনতেই পেল না।

কি অদ্ভুত। টিকটিকিটা একটুও নড়ছে না। অথচ শঙ্করের চোখের পাতা কতবার পড়লো এর মধ্যে। কতবার চোখ এ কাঠ থেকে ও কাঠ নড়াচড়া করলো। এ চৌকি ও চৌকি প্রায় গা ঘেঁষাঘেষি করে বাস করছে। উপায় নেই। দু'টো জলচৌকির মত টেবিলেরও স্থানাভাব হয়নি রুমের মধ্যে। দরজা দিয়ে ঢুকলেই পায়ে চৌকি লাগবে, কাজেই দরজা থেকে সোজা চৌকির উপর। চেয়ারের জায়গা নেই। অতিথি অভ্যাগত যারা আসবেন তারাও মনে রাখবেন যে এটা একটা হোটেল। কারো নিজস্ব বাড়ী নয়।

শঙ্কর চোখ দু'টি নামিয়ে এনে বালিসের দিকে একবার তাকাল। না : খুব ময়লা হয়নি ত সেটা। আরও ক'দিন নির্বিকার ভাবে এর উপর মাথা রাখা যাবে। চাদরটা? শঙ্কর তাড়াতাড়ি তোষোকটা ঢেকে নিল চাদরটা দিয়ে।

ছারপোকারা কিছুতেই মরে না। ছারপোকা ধরতেই তার একদিন গা কেমন পিল-পিল করতো, ভয় করতো, ঘৃণা করতো, আজ নির্ব্বিচারে অন্ধকারে সে তাদের হত্যা করে। তবু মরে শেষ হয় না।

ছারপোকার ডিম খেতে পিপড়াদের কি লোভ। কখন যে তারা লাইন বেঁধে

বিছানার এখানে ওখানে উপস্থিত হয়। তারপর শঙ্কর শুধু টের পেতে থাকে তার বন্ধুরা তার আশে পাশে যেন সজীব আছে—। বন্ধু হয় ছারপোকা—অথবা পিপঁড়া কিংবা টিনের আর টালির যুগ্ম তাতা গরম।

শঙ্কর একবার পাশের সীটে তাকাল—

পাশের সীটের রাধাবাবু কালকেই সন্ধ্যার ট্রেনে বর্ধমান গেছেন। বৌ আছে ছেলেমেয়ে আছে। শেয়ালদা বাজার থেকে নতুন-ওঠা ইলিশমাছ ইদানিং প্রতি শনিবার তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। শানিবার রাত্রি—রবিবার পুরো দিনরাত্রি এবং সোমবার সকালের কয়েক ঘণ্টা আরামে ছাতের এই চিলে কোটায় সম্রাট হতে পারে শঙ্কর।

সাপ্তাহিক ছুটির এই আরামটুকু রাধাবাবু বর্ধমানের বাড়ীতে এবং শঙ্কর এখানে সম্পূর্ণ নিজের আওতায় বেঁধে রাখতে পারে।

রাধাবাবুর টেবিলের উপর একবার চোখ ঘুরে এসে থামল শঙ্করের। একটা ছোট-খাটো ফটো। ফ্রকপরা, মাথায় ফুলবাঁধা ছোট একটি মেয়ে। রাধাবাবু বলেন এটি তার লক্ষ্মী। তারপর নাকি আর তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। তার আগে নাকি স্ত্রীর গঞ্জনা আর নিজের মানসিক ক্লেশে অবগুণ্ঠিত হচ্ছিলেন তিনি। রাধাবাবু ছ'টি সন্তানের জনক। এদিকে আপার ডিভিসন ক্লার্ক। শঙ্কর দেখলো টেবিলের উপর গীতাটা রেখে গেছেন রাধাবাবু। মা কালীর ফটোখানি রয়েছে। শঙ্করকে যাবার সময় বলে গেছেন বরবার, যেন সে সেই ফটোর কাছে একটু ধূপ জেলে দেয় রবিবার সকাল সন্ধ্যায়। কিছুতেই যেন না ভোলে।

অথচ ফিরে এসে প্রায় প্রত্যেকবার রাধাবাবু সোমবার রাতে ওকে জিজ্ঞেস করেন: 'কি মশায়, ধূপটুপ দিয়েছিলেন তো? নাকি মিছে কথা বলছেন?'

'না—না। দিয়েছিলাম, আপনার ধূপকাঠিগুলো গুহুন দেখবেন ঠিক গুনে গুনে কাঠিগুলো কমে গেছে মানে পুড়ে গেছে।'

'কি জানি মশাই, আপনারা সাহিত্যিক লোক। আপনাদের দু'টি জিনিষ করতে নেই।'

'কি করতে নেই?'

'আপনাদের বিশ্বাস করতে নেই আর বিয়ে করতে নেই।'

রাধাবাবু সোমবারে বাড়ি থেকে ফিরে প্রায়ই সে কথা বলতেন গায়ে লেগে থাকত বাড়ির গন্ধ আর সত্যি কথায় ধূপ জ্বালার। কথাটা রোজই ভুলতো শঙ্কর। সকাল আটটা পর্যন্ত ছারপোকাদের পৃথিবীতেই তলিয়ে থাকেন সে। ঘুম ভাঙ্গে আগেই। কিন্তু

উঠতে উঠতে অনেক দেরী হয়। আর ভাবে ছারপোকাদের এত আদর করে ধূপগন্ধে ভূষিত করে তৃষ্ণার্ত করে কি লাভ? তার রক্তই তো মিঠে।

বালিশটাকে আরও কিছুক্ষণ চেপে মরার মত পড়ে থাকতে থাককে মনে হল শঙ্করের দেখা যাক সেই টিকটিকিটাত এখনও ঝুলে আছে নাকি। শঙ্কর টালির ছাদের দিকে তাকাল। আশ্চর্য। এখনও, এখনও ঝিম মেরে আছে ওটা। অথচ ঠিক শঙ্করের মতো নয়, যেন স্পষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছে প্রাণীটা। নিঃশ্বাস নিচ্ছে তো? কাল রাতের শিকার ওর নিশ্চয়ই প্রাণভরা পেটভরা আস্বাদ দিয়েছিল। নইলে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীতো ঝিম মেরে শুয়ে থাকে না আটটা পর্য্যন্ত।

রাধাবাবু শনিবারের সকালেও বলেছিলেন ওকে।

'ভগবানে বিশ্বাস করুন মশাই। শুধু মা সরস্বতীই নয়, মা লক্ষীর কথাগুলো মনে করুন। লক্ষী। লক্ষীই সব। পৃথিবীটা লক্ষীর বশে, বুঝলেন?

'বুঝলুম'

'তাহলে?'

'কি করবো তাহলে?

বাঃ, চেষ্টা করুন। এই আটটা পর্যন্ত না শুয়ে চারটায় উঠুন—সন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভগবান মানুন। লক্ষীর স্মরণ করুন আর দেখবেন চাকরী জুটে গেছে ধাঁ করে—'

'ধাঁ করে?' শঙ্কর হেসেছিল: 'কোন্ ঠিকানায় সেই দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় তাই তো এতকাল খুঁজছি রাধাবাবু। ডালহৌসী আর এ্যাস্প্লানেড কোথাও যে তিনি নেই।'

'আছে, আছে।'

হাঁটু পর্যন্ত সরষের তেল মাখতে মাখতে বলেন রাধাবাবু: 'না থাকলে আমরা কি এমনি এমনি পেয়েছি মশাই, শুধু কলেজে গিয়েছিলাম—। অথচ আপনি তো ইউনিভারসিটি ডিঙ্গিয়ে এসেছেন।'

তারপর নিজের মনেই যেন বললেন রাধাবাবু: 'আসলে আপনি সরস্বতীর নেক্ নজরে পড়েছেন। আর তাই মা লক্ষী হাড়ে হাড়ে চটে গেছেন। কি আর করা।

স্নানে চলে যেতেন। হোটেলের স্নানঘরে তখন—ধমাধম জল ঢালছে। কে মার্গ সঙ্গীত গাইছে। কে চিৎকার করছে। কে এ্যামেরিকা-ভারতবর্ষ-রাশিয়ার শ্রাদ্ধ করছে। লাইন পড়ে গেছে সেখানে—লুঙ্গি-গামছা-টুথপেষ্ট আর সাবানের।

হোটেলের দোতলায় এক দাদু আছেন। সমস্ত চুল তাঁর পেকে গেছে। কবে নাকি

স্কটিশ না সেণ্টপলসের প্রফেসার ছিলেন—তারপর যুদ্ধের যুগে ওকালতির জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন পড়ানোর কাজ। দোতলার কোণার দিকের ছোট্ট একটা ঘরে তিনি থাকেন। আজ পঁচিশ বছর এই একই হোটেলে তাঁর কাটছে। একা অথচ ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, বাড়ীও নাকি আছে। দীর্ঘ দেহ ঋজু বলিষ্ঠ এক যুগের মানুষ শঙ্করের যুগে বাস করছেন—শঙ্কর মনে মনে তাকে দেখলো। রোদ পোহাইতেই যেন রোজ ছাতে উঠে আসেন ভদ্রলোক। ছাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে বেড়াতে বেড়াতে পায়চারির ফাঁকে একবার শংকরের টিনের ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ান উনি, বিড়িটা ঠোঁটে আস্তে আস্তে তখনও জলছে :

'দাদু—?'

উনি ডাকেন।

'কে—?'

'এখনও উঠেননি?'

'হ্যাঁ—এই মানে'—শঙ্কর ভাবছিল : খুব কি বেলা হয়ে গেছে? কি হয়েচে তাতে, তার তো কোন কাজ নেই। তার আবার রবিবার?

'উঠুন, চা খান—সকাল সকাল গরম জিলিপি···' বুড়ো বলছিলেন : 'কমলা ভাণ্ডারের জিলিপির মচরমচ শব্দে নিচের তলা জমে উঠলো, আর আপনি এখনও'—শংকর বলল : 'এখনও ছারপোকার কামড় খাচ্ছি, কি বলেন দাদু?'

'হা-হা-হা'—দাদু দূরে সরে যেতে যেতে বিড়িটার ধোঁয়া ছাড়ছেন :

টিকটিকিটার লেজ নড়ছে, স্পষ্ট। আবার কি খাবার দরকার হয়ে পড়ছে তার—আবার উৎসের সন্ধানে? নাকি তার খোলা চোখের ঘুম মানুষের স্বরে ভেঙে গেছে ছত্রখান হয়ে?

'হোটেলে মানুষ থাকে, মশায়!'

দাদু বলছেন।

শঙ্কর বিড়ি খায় না, সিগারেটও অচল। কি করবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি নিমের ডাল একটা পাতলা দেখে তুলে নিলে, দু' দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরলে সে দাঁতনটিকে, বেলা একটু হয়েচে, তা হোক। কিন্তু এবার উঠতে হয়। রোদ ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র, এমন কি চিলে কোঠার শিক আর টিনের রন্ধ্র অতিক্রম করেও আলোয় আলোয় ভেসে গেছে সব। ছারপোকারা পালিয়েছে, তাদের ঘুম শুরু হোক এবার।

হাতমুখ ধোয়া ইত্যাদির পর শঙ্কর আবার সেই চিলে কোঠাতেই ঢুকতে বাধ্য হলো।

এক কাপ চা খেতে হবে। একটা টোষ্ট খাবে কি সেই সঙ্গে? নাঃ তাহলে আবার নয় পয়সা অতিরিক্ত খরচ। রাত্রে কয়েকটা ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিল শঙ্কর, তাই মুখে দিলে সে। যথেষ্ট প্রোটিন আছে ছোলায়।

শঙ্কর একবার ভাবলো, রাধাবাবুর বিছানার চাদরটা বেশ পরিষ্কার। উনি বলেন এ সব তার স্ত্রীর কথায় শুনে শুনে মানতে হয় তাকে। এমনকি রোজ, গায়ে তেল মাখা পর্যন্ত।

কিন্তু রাধাবাবুর বিছানার চাদরটা—।

শঙ্কর নিজের বিছানার দিকে তাকাল, বালিশটা সত্যি অসহ্য। কোন্ সুস্থ দৃষ্টিতে—কি করে সারারাত ওর ওপর মাথা রেখে পড়ে থাকে সে—? চাদরটা?

নাঃ অবিলম্বে লণ্ড্রিতে না দিলে রাধাবাবুই তাকে রুম থেকে বার করে দেবেন। কিন্তু—না, চায়ের সঙ্গে একটা টোষ্ট কিছুতেই খাওয়া যাবে না। উপায় কি! গতমাসের চায়ের বিলটাই বাকী আছে।

শঙ্কর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো। একটু পাতলা করে এক কাপ চা। রাধাবাবুর টেবিলের মা কালী, বা ওই গীতা আর পরলোকতত্ত্বের বইগুলো যতই অদ্ভুত লাগুক ওর কাছে, শঙ্করের মনে হলো বিছানাটা রাধাবাবুর সত্যি সুন্দর। পরিষ্কার, তাছাড়া রাধাবাবুর গায়ের সাবানের রংটিও বেশ। তেলের শিশিতে তেলও অনেকখানি আছে। পাউডারের একটি মোটা টিনও যেন রেখেছেন রাধাবাবু। আয়না আছে, আছে চিরুনী। আর নিজের টেবিলের দিকে তাকাল এবার শংকর। নিজে একটা কাঠের সেলফ্ কিনেছিলো টাকা করে—তাতে বোঝাই হয়ে আছে বই। টেবিলে ছড়িয়ে আছে পাতলা আর মোটা নানান বই-ইংরেজি আর বাংলা। আর সাময়িক পত্র-পত্রিকা—যেন একটা ছোট্ট লাইব্রেরী। রাধাবাবু চটে বলেছিলেন যেন কবে; 'ওগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করুন, দেখবেন চাকরী পাবেন। সাহিত্য পাঠ ছাড়ুন মশায়। গল্প লেখা ছাড়ুন। কতদিন আর দাদাদের ঘাড় ভাঙবেন। বয়স হয়েচে, এবার একটা চাকরী করুন। চাকরী পান, তারপর দেখবেন, গল্পের নায়িকার মোহ কেটে গেছে তখন সত্যিকার নায়িকারা আসবে, তাদের মায়েরাও আসবেন। কি যে করেন, সাতাশ আঠাশ বছর বয়স হলো। আমরা ক'ছেলের বাবা হয়েছি ততদিনে জানেন?'

শঙ্কর একটা বই টেবিল থেকে হাতের মুঠোয় তুলে নিল। জীবনের কত প্রিয় একটি নাম—"চিঠি দিয়ে এলাম"। লেখক—শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি চিঠি গতকাল পেয়েছিল শঙ্কর। অনেক পাঠক পাঠিকার মধ্যে কোন এক পাঠিকা।

ধন্যবাদ আর প্রশংসার পর পাঠিকার লেখনী সীমানা হারিয়েও অনেকখানি এগিয়ে এসেছে চিঠিতে। লিখেছেন উনি, শঙ্করকে উপন্যাসের এ গল্প কে বলেছে? নিশ্চয়ই *সেই পাঠিকার জীবনের সঙ্গে শঙ্করের পরিচয় আছে, নিশ্চয়ই পাঠিকার কোন বন্ধু* শঙ্করকে এ কাহিনী বলেছে। নইলে পাঠিকার গল্পের সঙ্গে লেখকের কল্পনা কোন্ জাদুতে মিলে গেল? তাছাড়া, যা একটি নারীর হৃদয়ের সম্পূর্ণ একক প্রশ্ন লেখক তা কি করে টের পেলেন?' ডাকে প্রকাশকের কাছে এ চিঠি এসেছিল। শঙ্কর কাল পড়েছে হোটেলে ফিরে সে চিঠিখানা। প্রকাশক এখানে পাঠিয়েছিলেন। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতে হয়েচে—চাকরীর খোঁজে। রাধাবাবু যেন ঠিক বলেছিলেন, বেকারী মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্তরায়, ছাইএ ঢাকা আগুনে ছাইএর যা ভূমিকা 'চাকরী খুঁজুন'। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াগুলো নিয়েও চাকরী জুটছে না কেন। বোঝে না শঙ্কর। ওই টিকটিকিটার মত ভীষণ কি ওর দৃষ্টি যা অফিসের সাহেবদের স্বাধীনতায় ঘৃণিত হচ্ছে বারবার? সমাজের ডালি ভরে উঠছে তবু।

সেই সম্মানের ওই চিঠির শেষ দিকটায় শংকর চমকে উঠেছে: ঝংকৃত হয়ে উঠেছে পাঠিকার মন: আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কোথায় থাকেন আপনি? কোন্ ঠিকানা, প্রকাশকের কাছে গেলে অবশ্য পাওয়া যাবে। তবু দয়া করে আপনি যদি আমার পত্রের উত্তর দেন তাহলে বাধিত হবো। আপনার সুবিধেমত সময়েই আমি দেখা করতে চাই। আপনার বাড়ীতে, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে দয়া করে আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আশাকরি একটি পাঠিকার অনুরোধ আপনি ভুলবেন না।' কোনো এক পাঠিকা লিখেছেন। কোথায় মিলে গেছে তার জীবনের গল্প বোধ হয়। শঙ্কর ভাবছিল তার ঠিকানা ত একটা হোটেল, আর এই রকম একটা চিলেকোটা, আর ছারপোকা-মাকড়শা-পিঁপড়ার পৃথিবী। না, তা সম্ভব নয়। ভিজে ছোলার অবশিষ্ট কয়েকটা মুখে ফেলল শঙ্কর। তার এই দৈন্য কেউ যেন না দেখে। কোন পাঠিকা কোন আত্মীয় কোন প্রেয়সীই রাধাবাবুর মত তার দারিদ্র্যকে, এই তেলচিটে জগতটাকে সহ্য করবে না। তারা তা আশাই করবে না।

বড় লোভ হলো শংকরের যদি অবশ্য কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করা যায়—হোটেলের বাকীতে কিছু গোঁজামিল দিয়েও যখন কিছু অবশিষ্ট থাকবে—এ সুযোগে বিছানার চেহারাটা ওতো পালটে ফেলতে পারে। টেবিলটায় রাধাবাবুর জীবনের একটু স্পর্শ আনতে পারে। সুন্দর ১টা তেলের শিশি, আর একটা পাউডারও রাখতে পারে। একটা দামি সাবান কিনতে পারে।

নিজের দিনলিপিতে আচড় কাটে শঙ্কর। বের হবার কথা মনে পড়ে। আড্ডার

কথা। বন্ধুবান্ধবদের কথা। সেখানে চাকরীকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকা যায়-ভোলা যায় বিচিত্র সব ছাড়পোকাদের। নাঃ। মাসের এ সময়ে কে তাকে টাকা দেবে?

কিন্তু উত্তর কিছু লিখতে হবে। চিঠিটাকে অনুত্তর ফেলে রাখতে ইচ্ছে করছে না শঙ্করের। স্তূপীকৃত চিঠি থেকে ওই একটা চিঠিকে সযত্নে সে হাতের ভাঁজে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

এমন একটা কদর্থ ঘরে এক পাঠিকার সুন্দর মনের অপমৃত্যু সে দেখতে চায় না। রাধাবাবুর সাহায্যে নিজের রূপ ধার করে বদলাতেও কেন ইচ্ছে হয় না। রাধাবাবু অবশ্য সুন্দর একটা বালিশের ঢাকনা দিতে পারেন, পাঠিকা আসছেন শুনলে দু'টি সন্তানের পিতা হলেও তার হয়তো একটু দয়ামায়ার উদ্রেক হবে। হোটেলের নিচে উপরে গুঞ্জন উঠবে। কেউ কেউ বর্ষাতে ছাতে উঠে তখন পায়চারি সুরু করে দেবেন। চোখ তাদের পড়ে থাকবে এই চিলে কোঠায়। না, তাও করতে পারে না শঙ্কর।

দাদু ঠিক বলেছিলেন, হোটেলে যারা বাস করে তারা ত ক্ষুধার্ত। তাদের চোখে পৃথিবীর রং ফিকে হয়ে যায়। আশে পাশের বাড়ীর লোকেরা তাদের মনে করে—।

একি, চিঠিটাকে হাতের মুঠোয় পিষে রেখেছে কেন শঙ্কর।

সুন্দর হাতের একটি চিঠি।

অন্তত তার সাহিত্যজীবনের এক স্মরণীয় পত্র।

না। একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়লো শঙ্করের। মনে হাসি পেল হঠাৎ। এসব কি ভাবছে ও, যেন ভাবনাটাও গল্পের গন্ধে ভরে উঠছে। হোটেল তো চমৎকার জায়গা। এখান থেকেই তিমির লাহিড়ী সিনেমার গল্প লিখে লিখে কোথায় বাড়ী তুলে ফেললেন, এখানকার ওই বৃদ্ধ দাদু রেঞ্জার্সের লটারী পেয়ে সবাইকে চমকে দিলে—এখানকার শঙ্করই তো উপন্যাস লিখে বেকার জীবনের কাহিনী প্রতিষ্ঠিত করল। শঙ্কর চিঠির কাগজ নিয়ে বসল।

লেখার সময় নিজেকে তার কেমন সম্রাট মনে হয়। ওই টিকটিকিটা সে সময় যেন ভয় পেয়ে আত্মগোপন করে। একবার সস্মিত শঙ্কর কড়িকাঠে তাকাল। মুখ নাড়ছে টিকটিকিটা। কোন ফাঁকে সে তার শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়তে ভুল করেনি। কি সুন্দর স্বাস্থ্য টিকটিকিটার।

শঙ্কর লিখতে লাগলো,

'আপনার পত্রের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। লেখকরা তো চিরকাল মিথ্যাবাদী। একটা গল্প আপনার জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে বলে আপনি বিচলিত হয়েছেন। কিন্তু, সত্যি, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ জীবনকে কেন্দ্র করে এ গল্প

লিখিনি। বিশ্বাস করুন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। আমার কোন কাহিনী যদি পাঠক-পাঠিকার মন স্পর্শ করতে পারে তাহলেই তা হবে আমাদের যথার্থ সাক্ষাৎকার। সত্যিকার আলাপ তো সেই। কিন্তু, তবু, যদি আপনি কষ্ট করে আসতেন তাহলে খুব আনন্দ হতো। কিন্তু আমি ভাস্যমান। কলকাতায় আমি থাকি না। কলকাতায় আমার কোন ঠিকানা নেই। চাকরীর খাতিরে বাইরেই থাকতে হয়।'

নাঃ। তবু বিছানার চাদরটা আজকে জলকাচা না করলে আজকের রাতে কিছুতেই শঙ্কর এ বিছানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতে পারবে না। বালিশের একটা ওয়াড় যে করেই হোক কিনে এনে ভরতেই হবে। শঙ্কর আবার লিখতে লাগলো :

'একটি নতুন লেখকে আপনি যতদিন সমাদর দিয়েছেন আমার জীবনে তা স্মরণীয় হয়ে রইলো। কলকাতায় কখনও স্থায়ীভাবে থাকতে পারলে আমার এবারকার অক্ষমতা আমি দূর করতে পারবো বলে আশা রাখি। আপনাকে সেদিন সাদর আমন্ত্রণ জানাবার গৌরব যেন আমি আশাকরতে পারি।'

চিঠিটা শঙ্কর খামে ভরে ফেললো। রাস্তার কোন পোষ্টবক্সে ফেলে দিতে হবে।

SAPTAPARNI

VISVA-BHARATI CHATRA-SAMMILANI ANNUAL
VOLUME 6 : 1963-64

EDITORS :

SRI SRIMANTA KUMAR JANA
SRI BALBIRSING KATH

SAPTAPARNI

CONTENTS

BERKELEY : AN IDEALIST

KALIPADA PAL

It has been a common practice to treat Berkeley as an idealist. He has been regarded in the histories of philosophy as a thorough going idealist and sometimes the reputation goes that he is the father of modern idealism. Calkins remarks that Berkeley has turned things to thoughts. The arguments in favour of treating Berkeley as an idealist may be summarised in the following two propositions :

(A) ESSE est Percipi i. e. that the ideas exist in the mind.

(B) The Sensible ideas are created by an Infinite spirit who is identified with God.

Our main endeavour will be to examine the above propositions with Berkeley's treatment of and answer to the problems of (i) the relation between the finite mind and the world, (ii) the relation between the world and the infinite mind and (iii) the relation between the finite mind and the infinite mind.

Let us examine the first proposition : ESSE est Percipi has been generally interpreted to mean that existence consists in being perceived. But from this it never follows that existence in identical with being percived. What is meant by this phrase in that existance is always in some relation to mind, and the abstract existence without the mind and unrelated to mind is inconceivable. It is a sheer abstraction. Berkeley was thinking of the concrete 'existence' and his arguments directed to sweep aside the notion of abstract matter clearly reveals this. But does the phrase 'existence in some relation to mind' imply that Berkeley is a subjective idealist ? Let us have a pause for the answer and examine what is meant by 'ideas' exist in the mind. Berkeley uses the word 'idea' to mean both the "ideas of imagination" and the "ideas of sense". But the word 'idea' has a special significance to Berkeley. He does not use the word 'idea' in the sense in which Locke used it. To Locke whatsoever is the immediate object of understanding' is the 'idea' and this 'immediate object of perception' is caused by a chain of material causes i. e. the substances with their qualities. Berkeley rejects this three term process of preception. Leaving aside the ideas of imagination', we may point out that Berkeley uses 'the ideas of sense' as a synonym of things, i. e, concrete objects. He says, "we eat ideas' we drink 'ideas' etc. Why does then Berkeley uses "ideas" as a synonym of things ? This is precisely

because of two reasons : (i) As an empiricist he believed that we can perceive things not wholly but as congeiries of sensible qualities, not all of which are always perceived. To take an example, we often say, 'I see a book,' but we actually see certain colours and shades and often infer that there are also extended pages, solidity etc., which are not seen at that moment. And our error is due to the fact that this inference may not always be correct. So to avoid these difficulties Berkeley used this neologism 'idea'. "An idea is thus a statement of immediate preception without any kind of inference involved therein."

(ii) The second reason is that no other choice was left at that time. He was well aware that the term 'things' cannot clearly explain this immediacy and directness of perception. So he was bound to use the word 'idea' for the objective world. If Berkeley were writing to day he would use the term now in vogue 'sense datum. which are things that are immediately known in sensation : such things are colours, sounds, smells, hardness, roughness and so on." B. Russell declares in his later writings 'Our knowledge of the external world,' 'An outline of Philosophy' and 'The Analysis of matter' that physical object or matter is nothing but a collection of different sense-data which are presented to us. 'Matter' is a logical construction and not a real existent. Russell's elimination of 'Physical' objects' reminds us of Berkeley's denial of matter that it is nothing but a cluster of sensible qualities.

All these point out somekind of kinship between Berkeley and the neo-realist specially on this that both reject the three term process of perception, and emphasise the direct awareness and the immediacy in perceiving the sensible qualities or the sense-data. Thus Berkeleys call for concrete thinking, when he speaks of concrete existence i. e, esse est percipi', is like the modern's call to direct awareness. Berkeley is determined to think what he thinks and not to some substitute object. He says "contact your object, consider the actual colour you see and the actual roughness you touch, and you will not be led away to the futile chase of abstraction........the something we know not what !" So according to Berkeley 'existence' means the existence for the mind "existence as object of mind, existence perceived !"

This position of Berkeley is not that of a subjective idealist. For firstly (i) Berkeley has a drawn a distinction between the ideas of sense and the ideas of imagination. The ideas of sense are not the subjective

projections of the mind, as the Vijnanavadin (a school of Buddhism) holds, but are given from outside. His denial of material substance and the naming of the objects of sense does not make them notional or subjective, nor confound them with the objects of imagination. (2) He makes a distinction between the finite mind and the infinite mind. These objects of sense which are "the other" to the finite mind in the epistemological situation are excited by the will of God—are the creations of God. Individual's perception of them does not bring any change into their nature. Thus in the epistemological situation considered from the stand point of finite mind, the sensible objects of perception i. e, the sensible ideas exist independently of the mind in the sense that the activity of mind cannot transform the nature of these 'ideas'. Besides this, whether the individual mind perceive them or not, the things (ideas of sense) remains the same. Thus from the standpoint of epistemological relation Berkeley was neither a subjective idealist nor a 'Kantian' idealist but a 'neo-realist' though this is not explicitly stated in the 'Principles'.

(B) Let us now examine the second proposition—'the sensible ideas are created by the will of the infinite mind or God. Berkeley has openly stated this proposition and there cannot be any divergency of opinion with regard to this. But does this statement lead to hold Berkeley as an objective idealist—precisely in the Hegelian sense ? Our contention is that Berkeley cannot be called an objective idealist, for such an interpretation of Berkeley stands contradicted with the radical dualism of spirit (mind) and objects (sense-data or 'ideas'). Objective idealists like Hegel holds not only that 'the other'—the external objects are the expression of the infinite but also the position that these objects are in essence (nature) spiritual. Thus we find that though Hegel retains the distinction between the 'self' and the 'not-self'—'mind' and the world', the infinite Mind is present in both of these. There is the immanence of spirit in the objects. Though Berkeley speaks of the infinite mind and shows that the sensible ideas are the creation of God, he retains the distinctton between the spirit and the objects. The spirit is active whereas the objects are passive He holds in one of his philosophical commentaries that the bodies exist without the mind in the sense that they are distinct from the mind. "Bodies exist without the mind i. e, are not mind, but distinct from it. This I allow, the mind being altogether different from." The phrase 'esse est percipi'or 'existence is in the mind' cannot necessitate us to accept

the principle of immanentism of Hegel, which is quite incompatible with the dualism found in the epistemological situation because he hold (a) that mind and 'ideas' (things) to be of natures perfectly disagreeable and unlike (b) that although he writes of ideas existing within the perceiving mind, he denies that they belong to mind as a mode or property.

Yet the question remains that if we take the minimum definition of idealism that 'the other' is ultimately dependent on mind irrespective of its nature' then Berkeley must be regarded as an idealist. But this is, we think, a very narrow use of the term.

The truth remains that in Berkeley we find several philosophical lines of thinking, one mixing up with the other and it is very difficult to emphasise the one neglecting the other. We find, besides this loose idealism' also a kind of absolutistic tendency when we try to understand the precise relation between the finite mind and the infinite mind, the world and the infinite spirit. Not only not that God is the efficient cause of the universe which as 'objects of sense' are given to the finite mind, but that the way in which the finite mind perceives the sensible objects is determined by God. Immortality soul is a mere name, the soul is ultimately destructible if so willed by God. Thus we find that finite spirits practically speaking have no freedom. This is because of his emphasis on overwhelming theism. The key-note of his Philosophical construction was the establishment of theism, and the rejection of atheism and irreligion, "The main drift and design of my labours, so shall I esteem them altogether useless and ineffectual if by what I have said I can not inspire my reader with a pious sense of the presence of God." To perform this task Berkeley denied matter (abstraction of Locke), the root cause of atheism and this he approached from a common sense empiricistic stand point which if well developed clearly reveals a neo-realistic position.

So it cannot be denied that from the epistemological view-point Berkeley's position was akin to that of a neo-realist. From the metaphysical standpoint we may call Berkeley an idealist in the loose sense of the term, ii we keep in mind the basic insight of his position as the background, namely his overwhelming theism which is often neglected.

BERTRAND RUSSELL'S VIEWS ON RELIGION

D. DANIEL

Bertrand Russell is one of the most courageous and critical philosophers of modern times. He is a free-thinker, and is well-known for his out-spoken boldness in social, religious and philosophical matters. Russell is much opposed to the established religions of the world, so that he finds it necessary to put it in black and white his antagonistic views with regard to the question of religious beliefs and practices. Russell comes from a Christian family, but curiously enough, he directs his trenchant criticism, chiefly, against Christian doctrines and traditions.

In his book—or a collection of his essays—entitled "Why I am not a Christian," Russell labours to expose the shallowness, if not the falsity, of all the major religions in general, and of Christianity in particular. In the first essay, the heading of which has been chosen for the title of this book, namely, "Why I am not a Christian," Bertrand Russell argues that one happens to be an adherent of a religion not necessarily because one is convinced of its truth, but simply because one is born into the environment, where that particular religion is practised. In the first part of this essay, Russell undertakes to refute the traditional arguments or proofs offered by the Scholastics or the Mediaeval Christian Philosophers to prove the existence of God.

The first argument of the Scholastics in proof of the existence of God is known as the "Argument of the First Cause." According to this argument, it is held that everything we see in this world has a cause, and as we go back in the chain of causes further and further, we must come to a First Cause, and to that "First Cause" we give the name "God." Russell says that this argument does not carry much weight. He confesses that he had also believed in this proof, until he was eighteen years of age, but, one day, when he read John Stuart Mill's autobiography, he found there this sentence : "My father taught me that the question, 'who made me ?' Cannot be answered, since it immediately suggests the further question, 'who made God ?'" Russell thanks his stars that he hit upon this sentence, which, as it were, awoke him from his dogmatic slumbers.

Russell argues that, if everything must have a cause, then God also must have a cause, and if there can be anything without a cause, it may just as well be that the world did not require a cause. He observes that

the Hindus' View that the world rested upon an elephant and the elephant rested upon a tortoise, begs the inevitable question : "upon what did the tortoise rest ?" There is, according to Russell, no answer for this question. He is of the opinion that there is no reason why the world could not have come into being without a cause ; nor, on the other hand, is there any reason why it should not have always existed. There is no reason, says Russell, to suppose that the world had a beginning at all. He remarks that the idea that 'things must have a beginning' is, really, due to the poverty of our imagination. God need not be posited to explain the genesis and growth of the world, declares Russell.

Coming to the argument from "Natural Law," Russell says that it was a fovourite argument all through the eighteenth century. People observed the planets going round the sun according to the 'law of gravitation,' and they thought that God has given a behest to these planets to move in that particular fashion, and that was why they did so. Russell retorts that this theory was only a convenient and simple explanation that men invented to be saved of the trouble of looking any further for explanation of the law of gravitation. He contends that a great many things which we thought were natural laws are really human conventions. The whole idea that natural laws imply a 'law-giver' is, in Russell's view, due to a confusion between natural and human laws. Supposing we ask, says Russell, "why did God give only these laws, and not some others ?" the orthodox theologians would probably reply that "in all the laws which God issued, He had a reason for giving those laws rather than others—the reason, of course, being to create the best universe." Now, Russell remarks that, in that case, God Himself was subject to law—the law that he 'should' create the best universe !

Beatrand Russell is very pessimistic about the nature of the socalled "God-made world". He laughs at the believers in God, and says that the poor God, who had so carefully planned to create the best possible world, could not help producing such persons as Adolf Hitler and Joseph Stalin, and allowing the manufacture of such things as the Atom-bomb and the Hydrogen-bomb. He says that such a God is not at all worthy of worship, but only of shame !

Let us come to the third argument in proof of the existence of God. This is the argument from "Design". According to this, everything in the world is made just so that we can manage to live in the

world, and if the world was ever so little different we could not manage to live in it. Russell observes that this argument has sometimes taken a rather curious form. He says that Voltaire remarked that the nose of man was designed to be such as to fit spectacles, Somebody has remarked that rabbits have white tails in order to be easy to shoot. Russell thanks Charles Darwin who has dispelled the thick blanket of darkness that shrouded the secret as to the design of creatures. Darwin showed that the physical designs of the organisms emerged as the organisms strove to survive by adapting themselves to their given environments. There is no necessity of any such agency as God for the design of the world, and the things and the organisms that exist in it.

Bertrand Russell sarcastically observes that God, who is believed to have been the designer of men and things, does not deserve praise but fully deserves blame for His designing people like the members of the Ku-Klux-Klan or the Fascists.

Russell, now, turns to the "Moral Argument" in proof of the existence of God. He thinks that, by this argument, the theists lower their reputation much more. He commends Kant for disposing of this argument in the "Critique of Pure Reason", but Russell is sorry that Kant has not stopped there. Kant invented a new moral argument whereby he tried to show that unless God existed there would be no right or wrong. Russell contends that for our distinguishing between right and wrong, we need not resort to God. It is not through God that right and wrong came into being, but they are in their essence logically anterior to God. If God is the source of right and goodness, then he ought also to be the source of wrong and badness. How else can we account for the origin of badness and wrongness ? so argues Russell. Logically, if God is the source of badness and wrong, then. He is a very bad God !

The other argument is : "the argument for the remedy of injustice." The theologians say that the existence of God is required in order to bring justice into the world. In the part of this universe that we know, there is great injustice, and often the good suffer, and often the wicked prosper. But if we are going to have justice in the universe as a whole, we have to suppose a future life to redress the balance of life here on earth. So it is held that there must be a God, and there must be heaven and hell in order that, in the long run, there may be justice. Russell

feels that this is a very queer argument. We know only this world, and so far as we can argue at all on probabilities, we would say that probably this world is a fair sample, and if there is injustice here the implication is that there is injustice elsewhere also. Russell tries to illustrate his point in the following way. Supposing we got a basket or oranges opened, and we find all the top layer of oranges bad. Do we, asks Russell, thereby conclude that the underneath ones must be good, so as to redress the balance? No, ejaculates Russell, we would say that probably the whole lot is a bad consignment. And that is really, according to Russell, what a scientific person would argue about the universe. A scientific person would say that here, in this world, we find a great deal of injustice and there is no reason to suppose that the Deity has reserved the springs of justice to flow in some other world. All this talk about 'Heaven' and 'Hell' remedying of injustice by God in an 'After-life', contends Russell, is because people have been taught from their infancy to believe in them, and that is the only reason. For Russell all such talk is fictitious and superstitious—there is no God, no After-life, no Hell and no Heaven. Russell challenges that if people want to see injustice eradicated, let them do it themselves here and now.

According to Bertrand Russell, religion is based primarily and mainly upon fear. It is partly the terror of the unknown, and partly the wish to feel that we have a kind of "elder brother" who will stand by us in all our troubles and disputes Fear, says Russell, is the basis of the whole thing—fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Fear is the parent of cruelty, and therefore it is no wonder, for Russell, if cruelty and religion have gone hand-in-hand. For fear is the root of both cruelty and religion. Ruesell is of the firm conviction that science can help us to get over this fear in which mankind has lived for so many generations. Science can teach us not to look round for imaginary supports any more, not to invent allies in the sky. Science teaches us rather to look to our own efforts here below, to make this world a fit place to live in, instead of the sort of place that the religions have portrayed in their doctrines of Heaven.

Bertrand Russell appeals to men to stand up on their own feet and look fair and square at the world—its good facts, its bad facts, its beauties, and its ugliness; see the world as it is, and be not afraid of it. He asks men to conquer the world by intelligence, and not merely by being

slavishly subdued by the terror that comes from it. The whole conception of God, says Russell, is a conception derived from the ancient Oriental despotisms. It is a conception quite unworthy of free men. It is a folly of the first magnitude, in Russell's View, to call men miserable sinners, and it is the most debasing insult that man has foolishly ascribed to himself. It is a symptom of sadism and impotency. We ought to make the best we can of the world, and if it is not so good as we wish, after all it will still be better than what others have made of it in all these ages.

A good world, in Russell's opinion, needs knowledge, kindliness, and courage ; it does not need a regretful hankering after the past, or a fettering of the free intelligence by the words uttered long ago by ignorant men. It needs a fearless outlook and a free intelligence. It needs hope for the future, not looking back all the time towards a past that is dead which we trust will be far surpassed by the future that our intelligence can create.

Thus Bertrand Russell arrives at the conclusion that it is Science, and not God, that can explain the world ; and help us live a successful and prosperous life in this world. All the religions and their gods, in Russell's View, are "untrue". Hence the great need for free-thinkers and scientists to redeem men from the shackles of superstitious parctices and fictitious dogmas. This is the first part of the thesis that Russell offers against Religion. The second part consists in his exposition as to how religious teachings incite men to hate and harm other men (who belong to other faiths), and become averse to this world. This we shall take up after examining Russell's arguments against the belief in the existence of God, and the truth of the related questions such as Heaven and the immortatily of the soul.

Anyone who tries to prove that something is untrue is obliged, first of all, to putforth the criterion by which he would measure the truth or falsity of that something. But Russell, so far as this collection of his essays is concerned, has not given any such criterion or principle. He has simply, and arbitrarily, argued that all the religions and their dogmas are untrue. He has only tried to refute the arguments advanced by the Scholastics to prove the existence of God. This much is not at all an adequate ground to deny the existence of God and the truth of the religions which teach about Him. Russell may have had at the back

of his mind "the principle of verification" as the criterion of truth. The Logical Positivists (with whom Russell's sympathies lie) have insisted that unless a thing or a proposition is empirically verifiable, it cannot be true. I presume that Russell holds the same view, when he says that the question about the "First Cause" cannot be answered.

I am not arguing that this question can be answered. But I think that when we cannot answer a question, we cannot, at the same time, say that since it cannot be answered, it must be false. I would rather accept Immanuel Kant's position, because he was right in saying that such questions as the "First Cause" of the world etc., can neither be answered in the positive nor in the negative. When we tenaciously attempt to answer such questions we land up into antinomies. Unlike Kant, Russell has chosen to assert an emphatic negative in answer to such questions. This attitude, in my humble opinion, is dogmatic, if not fanatical.

Now, Russell's observation that "the idea that things must have a beginning is really due to the poverty of our imagination," is itself self-contradictory. Supposing there are two boys in front of me ; and I ask them "what is the source of curds ? They both say "Milk". Then "what is the source of milk ?" They answer "The Cow". Then, "how about the cow ?" They reply "Its mother-cow". Then I ask, "how about the mother-cow ?" At this point, one of the lads begins blinking because he thinks that if he says again "its mother-cow", he would have to repeat it "ad infinitum". But the other boy smiles and says, "well, sir, this question leads to an infinite reagress, but I would say the ultimate source of the cow is the creator of the cow". Now, I would say that whereas the first boy's imagination is poor, the second boy's is indeed rich. Strangely enough, Russell puts it the other way round. I am sure that common sense votes in favour of my judgment.

With regard to the argument from "Natural Law", I am surprised that Russell hastily concludes that the socalled natural laws are, at bottom, only human conventions. I guess that this contention of Russell's does not stand the test of truth. Before the day of Copernicus, people said that the Sun and the other planets revolved round the Earth—the geo-centric theory of revolution. That conventional belief was held to be true only up to the day of Copernicus. But when Copernicus found out that the Sun was the centre around which the Earth and other planets

revolved—the heliocentric theory—the people's convention which was in vogue till then had to give way to the objective truth. So, Russell's theory that natural laws are really human conventions is false. Human conventions are made and remade in accordance with the evidence we obtain from the objective facts and values. In short, it is not the natural laws, which depend upon human conventions, but it is the human conventions which are moulded in accordance with the available knowledge of the natural laws that are objective and independent. Whether these natural laws point to a God as their giver, I am not concerned to answer. But my point is that Russell's denial of the existence of God or the Law-giver on the strength of this argument does not cut much ice.

As for the argument of Russell that the Creator of the world—if there was a Creator at all—was an ignorant one, because he could not fore—see the emergence of cruel people like Hitler and Stalin, I would say that Russell seems to be ignorant of many things which we come accross in our daily life I hope Russell would not hold the maker of a tumbler responsible, when the tumbler slips from his (Russell's) hand and hurts his toes. Russell would not be so childish as to abuse the one who made the tumbler because it hurt Russell's toes. If there is someone who deserves abuse, it is the one who was careless in holding the tumbler. In other words, the maker of anything need not be held responsible for everything that his product may effect. But at this point I think Russell would retort that it is okay when we speak of men, but God, who is supposed to be omniscient (all-knowing) must, to be worthy of this great attribute, have such knowledge, and so "must" have taken precautions against the birth of such tyrants as Hitler and Stalin.

This brings me to strike a personal note here. As for me, I do not dogmatically hold on to the conception that God is like a grand old man with a large and flowing silver-white beard, and that He knows everything that has happened from time memorial and that would happen until the universe is reduced to a cipher. Such a naive arthropomorphic conception of God is, in opinion, neitner tenable nor credible. God, to my mind, is a symbolic expression to denote that there is some meaning behind the manifold facets of life in the universe. The universe cannot just be a chaotic and contingent interplay of things and forces. We say that the universe is a "Cosmos", because there is harmony, uniformity, meaning and sense in it. If there is not something (that

"something" I cannot express or define or describe myself) underlying all this fanfare of things, beings and events, I wonder why the winter in India does not commence one year in October, another year in May and yet another in August so on and so forth. The same question may be asked with regard to every uniformity, order and arrangement that is discernible in things around us and within us.

Well, Lord Russell may pat on my shoulder and say : "My dear boy, you need to study geopraphy, metereology, oceanography, astronomy etc. to understand why seasons set in in their own times". I would say : "Thank you, sir, but why should geographical and planetary systems, revolutions and seasons be just the way they are, and why should not they be as fickle and uncertain every moment ?" I do not know what Russell would say in reply, But, to my mind, it is a good reason to believe that there is some meaning, harmony and sense governing (with no gubernatorial implications) these seasons and planets ; and I would not mind calling such a principle of unity and order "God". for the sake of convenience and brevity, provided the symbol "God" is not misunderstood and misinterpreted in crude anthropomorphic terms.

Coming to the question of "the remedy of injustice" in an After-life or in another world like Heaven or Hell, I confess that it is not possible to cherish faith in these doctrines as they have been pictured to us by tradition. But I do believe that injustice cannot go un-punished or unredressed. Otherwise all our sense of morality and justice must be rejected as sheer illusion and mere ignorance. In that case we have no reason to judge an act to be a vice or virtue, good or bad, right or wrong. The assertion that men should deal with their fellow-men justly and honestly is meaningless ; and there is no reason why a person should desire to be virtuous at all. A man, who does not believe that "one who sows the seed reaps the fruits" has no reason why he should sow at all ; and if, by chance, he sows he has no claim to the crop. A person who refrains from stealing another's possessions, does so not simply because he is afraid that he would be punished if caught red-handed, but also because he feels that his crime will bring to him its own fruit, if not now, at least in future ; if not from society, at least from some other source. I think that the doctrine of "Karma" (divested of its mythical wrappings) is a better and more-effective theory than the doctrines of Heaven and Hell. Perhaps Lord Russell will have to tone down the temper of his

argument against the belief in "the remedy of injustice" if he is presented with the doctrine of Karma, which can be interpreted in purely psychological terms.

Let us now discuss the question of the "truth" of religions. The word "true" has been given as many as ten definitions in the "Concise Oxford Dictionary." It means (1) in accordance with fact or reality or (2) genuine or (3) in perfect tune or (4) Loyal or (5) Accurately or (6) in correct position or (7) Honest or (8) of genuine birth or (9) exact position or (10) Certain. Russell, when he says that all religions are untrue, is, perhaps, thinking only of the first (or only one of the shades of the) meaning of the word "true". He ignores all the other nine definitions the word "true" may have. I presume that, when Russell says that all the religions are untrue, he says so, because no religion can demonstrate the reality of the existence of God. His dictum cannot, however, disprove the truth of religions, if the word "true" is defined as "of genuine birth" or "in perfect tune" or as "loyal" etc. etc. I would venture to say that all religions are true, because they were in perfect tune with the times and environments in which they arose ; because their adherents are loyal to the religions ; because their adherents are honest with their beliefs. I would, therefore, assert that Russell's remark that all religion are untrue, is not well-throughtout, and it is highly ambiguous. Moreover, there are religions, which do not postulate the existence of God. Buddhism is an atheistic religion. Communism is a religion (Russell himself classifies it as a religion), which knows nothing about or says nothing in favour of God. In point of fact, "God" is the main target of attack from the ranks of Communism. When Russell bases his argument that all religions are untrue on the fact that the belief in God is false, he is undermining his own position. For he characterizes Buddhism and Communism as full-blooded religions (in which systems there is, evidently, no place for God, Heaven, Hell etc.), and yet thinks that his argument based on the falsity of these concepts repudiates these religions.

Thus we see that there are some religions which escape the scathing criticism of Russell. All religions can be called "true", if the variety of meanings, which this word yields are taken into consideration. For one reason or another, every one of the religions circumvents Russell's confrontation and condemnation.

Let us now hear Russell again as he makes out the second part of his case, namely, that "all the religions of the world are harmful."

In his essy,"Has Religion made useful contributions to Civilization ?" Russell says that he regards religion as a disease born of fear and a source of untold misery to the human race. He states that the only contributions which it has made to civilization is by helping in early days to fix the Calendar, and by helping the Egyption priests to chronicle Eclipses Beyond this, observes Russell, religion has done no good to human civilization.

Coming to the damage it has done to civilization, Russell uigorously asserts that religion has always been a poisonous element in human relations. Now he begins to bombard Christianity. To begin with the founder of Christianity, ie. Jesus Christ, Russell says that He has done more harm than good by His teachings such as "Take no thought for the morrow", "Man does not live by bread alone", etc. These teachings of Christ made the serious hearers lazy and lethargic. In the first century, many Christians in Palestine and other Mediterranian Countries stopped working hard ; for they believed that Jesus Christ would descend from heaven, at any moment, and so there was no need for keeping food or provisions for the next day when they would find themselves enjoying the bliss of Heaven. Unfortunately they were disappointed and disillusioned, when they found that Christ did not descend the next day, and their utensils were empty and without food. In this manner they were deceived by Christ's sweet words.

Jesus Christ spoke in bitter terms to those who did not follw Him, and He condemned them to miserable tortures in hell. Russell complains that such an attitude, on the part of the socalled "God-man" or "Saviour", is unbecoming of His stature and nature. Russell is all praise for Socrates, who was patient with, and kind to those, who derided him and who laughed at his teaching. According to Russell, this narrow and bigoted attitude of Jesus, the founder of Christianity, released an undesirable and unceasing animosity, in his followers, against the people of other faiths. Philosopher Russell stigmatizes the Christian Church which took immense pleasure in persecuting the non-believers down through the centuries. The "Crusades" in the Middle Ages offer some evidence of the barbarity and bigotry of Christianity. The crusaders believed that they would get their tickets to heaven, if they chopped off as many heads

of the non-christians as possible. The muslims in Asia Minor were brutally butchered by the zealous soldiers of the Cross. So, Russell emphatically asserts that religion is morally pernicious ; for it teaches ethical codes, which are not conducive to human happiness.

The worst feature of the Christian religion, in Russell's opinion, is its attitude to sex. He says that the claim of Christianity that it improved the status of women is false. Monks have always regarded woman, primarily, as the temptress ; they have thought of her mainly as the inspirer of impure lusts. St. Paul and other leaders of the Church looked down upon marriage as something mean and yielding to temptation. The Roman Catholic church opposes "birth control" and 'divorce'. Even if a woman is worn out by giving birth to one child per year, the Church says that she must not take precautions against conception ! If a young and healthy girl is, unknowingly, tied to a man (who has venereal diseases) in marriage, the church says that the girl has to live with that man, and cannot seek divorce ! Russell says that it is not only in regard to sexual behaviour, but also in regard to knowledge on sex subjects that the attitude of the Christians is dangerous to human welfare. The artificial ignorance on sex subjects, which orthodox Christians attempt to enforce upon the young is extremely dangerous to mental and physical health, and causes in those who pick up their knowledge by the way of "improper" talk, as most children do, an attitude that sex is in itself indecent and ridiculous. Almost every adult in a Christian Community, says Russell, is more or less diseased nervously as a result of the taboo on sex knowledge, when he or she was young. And the acute sense of sin, which is thus artificially implanted, is one of the causes of cruelty, timidity and stupidity in later life.

With regard to the Christian attitude to "the problem of suffering", Russell says that the usual Christian argument is that the suffering in the world is a purification for sin, and is therefore a good thing. This conception of "sin" and "suffering" does an extraordinary amount of harm, since it affords people an outlet for their sadism and masochism, which they believe to be legitimate, and even noble. Russell gives an example. He asks : "How can we legitimately believe that the wife and children of a man suffering from syphilis do deserve that suffering ?" Christians hold, according to Russell, that since that man sinned, he got syphilis, and so it is good that he, his wife and his children should suffer

for that. This view, to Russell's mind, is inhumane, and destructive for human civilization and welfare.

Bertrand Russell next takes up the conception of "righteousness". According to him, the psychological analysis of the idea of righteousness shows that it is rooted in undesirable passions. Unrighteousness is, in practice, behaviour of a kind disliked by the herd. By calling it unrighteousness, and by arranging an elaborate system of ethics round this conception, says Russell, the herd justifies itself in wreaking punishment upon the objects of its own dislike, while, at the same time, since the herd is righteous by definition, it enhances its own self-esteem, at the very moment, when it lets loose its impulse to cruelty. This is the psychology of "lynching", and of other ways in which criminals are punished. Russell concludes, therefore, that the essence of the conception of righteousness is to afford on outlet for sadism by cloaking cruelty as justice.

The Church's conception of righteousness, in Russell's opinion, is socially undesirable, because this leads to a depriciation of intelligence and science. Christ's teaching that we should "become as little children" in order to be eligible for inheriting the kingdom of God is at the root of the church's antagonism to Free thinkers and scientific progress. The Church opposed Galileo and Darwin ; in our own days, it opposes Freud's psychology. In the days of its greatest power, it went further in its opposition to the intellectual life. Pope Gregory the Great stopped a certain Bishop, who was teaching Latin grammar to his friends ; for the Pope thought that it was tantamount to sinning ! Russell recounts that the Church in Germany supported the royalty and their cruelty to peasants. The church opposed the abolition of slavery and the introduction of economic justice. The Pope has officially Condemned Socialism, which seeks to restore justice and happiness to all men irrespective of caste, creed, religion and nationality.

Lord Russell proceeds to point out similar bad elements in other religions. He refers to the Hindu strictures on women. The Hindu rules that widows should not be allowed to remarry ; the practice of child-marriage, the rigid laws against divorce, and the practice of polygamy are all evidences, in the opinion of Russell, that go to show that Hinduism has done a great disservice to its people.

The history of the Mohammedan religion, observes Russell, is stained with "bloody" events. The Muslims, in the Middle Ages,

slaughtered millions of people, who refused to accept Islam. Wherever the Muslims won a Victory and occupied the country, they forced their religion upon the invaded peoples. The Muslim soldiers believed that the more people they massacred in the name of "Allah", the better place they would be granted in heaven.

In view of these anomalies and atrocities with which almost every religion can be credited Bertrand Russell unsparingly condemns religions of any shades or creeds. According to him, the three human impulses embodied in religion are fear, conceit and hatred. The purpose of religion, says Russell, is to give an air of respectability to these passions, provided they run in certain channels. It is because these passions make, on the whole, for human misery that religion is a force of Evil. Religion prevents us from removing the fundamental causes of war ; it prevents our children from having rational education. Religion forbids us from teaching the ethic of scientific cooperation in place of old fierce doctrines of sin and punishment. In conclusion, Russell says ; "It is possible that mankind is on the threshold of a golden age ; but, if so, it will be necessary first to slay the dragon that guards the door, and this dragon is Religion.."

In his essay, "Can Religion cure our Troubles ?" Russell says that, throughout the West, there is a general revival of religion, because the champions of religion hope that the cause of all the problems and troubles that we find ourselves in, at the present day, is due to our less zeal for religion. The Christians in the West think that if the world accepts Christianity as "The Religion", our international problems would be solved overnight.

Russell remarks that this pious hope is a complete delusion born of terror ; and it is a dangerous delusion, because it misleads men whose thinking might otherwise be fruitful. It is customary among Christian apologists to regard Communism as something very different from Christianity, and to contrast its evils with the supposed blessings enjoyed by Christian nations. This seems to Russell a profound mistake. According to Russell, the evils of communism are the same as those that existed in Christianity during the socalled Ages of Faith. The "Ogpu" of Communism differs only quantitatively from the "Inquisition". Its cruelties are of the same sort, and the damage that it does to the intellectual and moral life of the Russians is of the same sort as that which was done by the Inquisitors, wherever they prevailed. The Communists

attempt to falsify history, and the Church did the same until the Renaissance. Russell says that it is the similarities, and not the dissimilarities, between Christianity and Communism that make these two religions incompatible with each other.

Lord Russell maintains that what he has said about Christianity applies equally to Communism, Islam, Hindusim, Buddhism, and all other religions. No religion can cure our troubles. As a matter of fact, religions are very detrimental to our life ; and the belief that they are useful for our welfare is only a delusion. To Russell's mind, what the world needs is not religion, but reasonableness, tolerance and a realization of the interdependence of the parts of the human family. This interdependence has been enormously increased by modern inventions, and the purely mundane arguments for a kindly attitude to one's neighbours are very much stronger than they were at any earlier time. It is to such considerations, Russell insists, that we must look, and not a return to obscurantist myths. What the world needs is not dogmas, but an attitude of scientific inquiry, combined with a belief that the torture of millions in the name of a religion or an ideology is not desirable, whether inflicted by Stalin or a devotee of a Deity.

I should say that I find myself agreeing quite a bit with Bertrand Russell, when he says and shows that religion has become a harmful element in human relations. What Russell has stated with regard to the animosity and ill-feelings that are created among peoples professing rival religions is very true. The people of one "faith" consider the peoples of other faiths to be their enemies ; and this feeling generates the burning desire that peoples of other religions should be won over to one's own religion by hook or crook. If that is not possible, at least, one who is so fanatical about one's faith, aims at getting rid of the existence of other religions. Russell is right in pointing to the bitterness which is dormant among the relations between one religion and another, and its catastrophic explosion when a suitable occasion arises.

To take a recent example. A few years back, when I was a postgraduate student at Jabalpur, there broke out a violent roit between the Muslims and the Hindus. The cause was, of course, a small one in comparison to the huge and heinous consequences it has brought about. We know that many cases of adultery and molestation and rowdism take place every day somewhere or other in our country. But all such crimes

do not touch off an inter-communal battle. The criminal, if caught, is punished, and it affects no one else. We read in the news-papers, quite often, that a man molested a woman, and then stabbed her to death etc, And the man is caught and duly punished. That is the end of the matter. But such was not the end of "the Usha Bhargava Case" at Jabalpur. Hundreds of people—many of them quite innocent—were shot dead or stabbed to death. The Muslims and their rivals, the Hindus, considered it a matter of religious (communal) duty to kill the opponents. This conflagration spread like wild-fire to many parts of India. Why, it has even kindled fire at Karachi ! Another event of such a nature, and of larger dimensions, has happened quite recently. And that is the Case of the theft of a holy relic from a mosque at Srinagar. The calamitous results that followed this incident are known to all of us, and suffered by many of us.

Therefore, I think that Bertrand Russell deserves applause for the pains he has taken, and the boldness he has summoned, in exposing to the world, the tragic nature of religious (in India it is synonymous with Caste or Communal) zeal and fanatism. The history of the world is, no doubt, speckled with such grim and gruesome events. But, I am afraid, this is just the dark side of the history of Religion. Religion, on the other side of its history, has a very commendable colour. What Lord Russell, in his impetuosity, has done is that he has "thrown the baby with the bath-water." He has burnt off the grain with the chaff ; rejected the kernel with the shell.

Russell has not taken note of the most valuable contributions the religions of the world have made to the human civilization and progress. We cannot, in a limited article like this, afford to survey the whole history of the world ; but we shall be content with one or two illustrations chosen from Indian history to show that religion has made Valuable Contributions to human welfare.

The reign of king Ashoka is considered as "the golden period" in the history of India. The national emblem of our country—the three-headed lion—is adopted from the famous pillar of Ashoka, because we consider that the life and state of affairs in the period of Ashoka were prosperous and happy. According to the Indian historians, Ashok's conversion (after the battle of Kalinga) to Buddhism brought about a total change in his foreign policy. He was converted from a 'blood-thirsty

attitude" of a monarch of those days, to an attitude of friendliness towards his neighbouring countries. He gave up the idea of conquering other states ; he remained on friendly relations with Chola, Pandya, Satyaputra and Keralaputra states. There was also a radical change in the internal policy of king Ashoka. He was against the killing of animals, he condemned bad behaviour, and he urged his people to practise good morals. He wished and worked for the happiness and prosperity of his people.

Ashoka attached great importance to the practice of "Dhamma" or Law of Piety. He identified Dhamma with the noble teachings of Buddha. The most important thing about Dhamma is its Cosmopolitan Catholicity. It has not the slightest touch of sectarianism. Ashoka describes Dhamma as follows : "Father and mother must be obeyed ; similar respect for living creatures must be enforced ; truth must be spoken..." "A meritorious thing is the harkening to father and mother ; a meritorious thing is liability to friends, acquaintances, relations and religious mendicants ; a meritorious thing is small expense and small accumulation." In his "Edict", inscribed on his second pillar, Ashoka says : "The Law of Duty or Piety consists in little impiety, many good deeds, compassion, liberality, truthfulness and purity."

Ashoka made wonderful conquests by Dhamma. He conquered many kingdoms and communities for Dhamma, for the humanitarian attitude. He defeated injustice and selfishness in the noble fight for Dhamma. He administered justice to all people, irrespective of caste, creed and community, of his empire ; he put an end to the bad administration in his kingdom. Hospitals were built for men and animals ; wells were dug. Trees were planted by the roadside to provide shade and shelter for the travellers ; alms were given to the poor.

Now, I would ask Bertrand Russell to explain as to what made king Ashoka render such great good service to his people, and adopt such a peaceful and friendly attitude to his neighbouring kingdoms. As for me, I do not see any other reason for such a noble life and philosophy which Ashoka had adopted. He was what he was, because of his deep faith in Buddhism, and honest practice of its teachings.

Coming to the modern period. The great reforms, which Raja Rammohun Roy and his followers introduced into the Hindu social and religious life were prompted by their new religious awakening. Brahma-Samaj, Arya-Samaj and other modern religious movements have done

much, and are doing much, in eradicating age-old undesirable social customs and superstitions They are running schools, orphanages, and many other kinds of institutions to cater to the needs of the poor and the needy. The same can be said of the Christian Church. The immense philanthropic work turned out by the Ramakrishna Mission in India belies the contention of Bertrand Russell that religion is only harmful to society. The Christian Churches in the West and in the East are waging a vigorous war against the "Racial discrimination" in America, and against the "Aparthied Policy" in South Africa. The philosophy of "Panch Shila," preached and practised by India, and accepted by many other countries, has its basis in the great religious heritage of India. One can, indeed, go on making a long list of such magnificent aspects of the history of every religion. But, for our present purpose, the above cited examples are more than enough to controvert the contention of Russell that all religions are both untrue and harmful.

We do, however, admit that, in the name of religion, men have done harmful things. But it does not mean that we should turn a blind eye to the very Valuable Contributions religions have made to the mankind; to its civilization and welfare. Religion has, no doubt, been responsible for some freaks in civilization, but it has also been responsible—responsible in a great measure—for many factors that have furthered the progress and prosperity of human society in a variety of ways. Has there ever been any human institution or organization, which has not done some harm along with some good to men? Obviously none. Do we reject the usefulness of an organization simply because some undesirable aftermath has become attached to it? Definitely not. Then, what justificati n is there to demand a total banishment of Religion, even it there is likelihood of it being misused?

THE PLEASURE OF FICTION

SEETA M. MAHARAJ.

Under the name fiction comes the name novel and romances. Out of these two, the novel has been most popular form of fiction, whereas the romance is loosing its popularity in the scientific age. In fiction, the experience and events are chronicled in a vivid manner and instead of being isolated and disconnected expressions of a mood they give a continuous story with all aspects of life.

It differs from story mainly on the ground that story gives or relates one event or one aspec of life. The novel however, has greater scope to relate the various mood and aspects of life. It can cover a wide range of things and thus be a rich source of information and knowledge.

Reading fiction is one of the portions in which it would freely indulge, for it is so very enriching and presents life in all aspects and shade. The novel which deals with the contemporary society, its customs, its people, their manners and their way of thinking. Pearl Buck wrote many novels on Chinese life such as "the Good Earth" and "Pavillion of Women".

It would be certain that men would be completely tired to read the account of such things put in a form of essay. Here the story of theme is interwoven so beautifully with the contemporary society with the characters. It is through the lady of the house and through her character that we understand the concubinage system, once-upon a time prevalent in China, their condition of its slaves and Chinese women's simplicity.

How convincingly Thomas Hardy draws the picture of Wessex people in all fields of life. From his works, we come in close contact with the people, their way of living, manners-and customs.

All authors have one purpose in writing and it is not possible that they would come out with their philosophy of life. Some do it directly, whereas some like Hardy leaves you with the impression and it is the readers to derive the hidden meaning and philosophy.

Novelists like Hardy, Dickens, Dumas, Emilezola and D. H. Laurance have certainly awakened the readers sympathy and understanding to such a extent that makes one wonder what mighty influence it must have produced in England in those times when such condition were actually present in life.

Such writers have talked with favour those elements and regions of society which are considered polluted but which exist due to our faults, and pecular pattern of society where economical and moral conditions are so difficult to be linked up.

It is not possible for a human being in his short span of life to have the opportunity of lowering accross these varied experiences covering all the walks of life. Everybody's knowledge is limited and it is only through these novels that we can learn to view things or life from different angles and enrich our understanding.

Novels and other forms of fictions are based on the taste of all classes of people. The popularity of the sentimental novels can never be challenged even in these modern days.

It is Bernard Shaw who says that "Love or sex is not necessary a fiction. However; the emotional appeal must be there. Fiction offers innumerable pleasure to the readers and will ever remain the most popular form of literature.

AN APOLOGY

SUBRAMANIAM GNANAVADIVELAN

Into our town the Hangman came,
Smelling of gold and blood and flame—
And he paced our bricks with a diffident air
And built his frame on the courthouse square.

The scaffold stood by the courthouse side,
Only as wide as the door was wide ;
A frame as tall, or little more,
Than the capping sill of the courthouse door,

And we wondered, whenever we had the time,
Who the criminal, what the crime,
The Hangman judged with the yellow twist
Of knotted hemp in his busy fist.

And innocent though we were, with dread
We passed those eyes of buckshot lead ;
Till one cried : "Hangman. who is he
For whom you raise the gallows-tree ?"

Then a twinkle grew in the buckshot eye,
And he gave us a riddle inslead of reply :
"He who serves me best," said he,
"Shall earn the rope on the gallows-tree."

And he stepped down, and laid his hand
On a man who came from another land—
And we breathed again, for another's grief
At the Hangman's hand was our relief.

And the gallows-frame on the courthouse lawn
By tomorrow's sun would be struck and gone.
So we gave him way, and no one spoke,
Out of respect for his hangman's cloak

II

The next day's sun looked midly down
On roof and street in our quiet town
And, stark and black in the morning air,
The gallows-tree on the courthouse square.

And the Hangman stood at his usual stand
With the yellow hemp in his busy hand ;
With his buckshot eye and his jaw like a pike
And his air so knowing and business like.

And we cried : "Hangman, have you not done,
Yesterday, with the alien one ?"
Then we fell silent, and stood amazed :
"Oh, not for him was the gallows raised..."

He laughed a laugh as he looked at us :
"...Did you think I'd gone to all this fuss
To hang one man ? That's a thing I do
To stretch the rope when the rope is new."

Then one cried "Murderer !" One cried "Shame !"
And into our midst the Hangman came
To that man's place. "Do you hold," said he,
"With him who was meat for the gallows-tree ?"

And he laid his hand on that one's arm,
And we shrank back in quick alarm,
And we gave him way, and no one spoke
Out of the fear of his hangman's cloak.

That night we saw with dread surpise
The Hangman's scaffold had grown in size.
Fed by the blood beneath the chute
The gallows-tree had taken root ;

Now as wide, or a little more,
Than the steps that led to the courthouse door ;
As tall as the writing, or nearly as tall,
Half way up on the courthouse wall.

III

The third he took—we had all heard tell—
Was an usurer and infidel,
And : "What", said the hangman, "have you to do
With the gallows-bound, and he a Jew ?"

And we cried out : "Is this one he
Who has served well and faithfully ?"
The Hangman smiled : "It's a clever scheme
To try the strength of the gallows-beam".

The fourth was a man of a darker hue
Than the rest of us, by a shade or two ;
And "what concern," he gave us back,
"Have you for the doomed—the doomed and black ?"

The fifth. The sixth. And we cried again :
"Hangman, Hangman," is this the man ?"
"It's a trick," he said, "that we hangmen know
For easing the trap when the trap springs slow".

And so we ceased, and asked no more,
As the Hangman tallied his bloody score ;
And sun by sun, and night by night,
The gallows grew to monstrous height.

The wings of the scaffold opened wide
Till they covered the square from side to side ;
And the monster cross-beam, looking down,
Cast its shadow across the town.

IV

Then thro' the town the Hangman came
And called in the empty streets my name—
And I looked at the gallows soaring tall
And thought, "There is no one left at all.

For hanging, and so he calls to me
To help pull down the gallows-tree."
And I went out with right good hope
To the Hangman's tree and the Hangman's rope.

He smiled at me as I came down
To the courthouse square thro' the silent town,
And supple and stretched in his busy hand
Was the yellow twist of the hempen strand.

And he whistled his tune as he tried the trap
And it sprang down with a ready snap—
And then with a smile of awful command
He laid his hand upon my hand.

"You tricked me, Hangman !" I shouted then'
"That your scaffold was built for other men......
And I no henchman of yours, "I cried,
"You lied to me; Hangman, foully lied !"

Then a twinkle grew in the buckshot eye :
"Lied to you ? Tricked you ?" he said, "Not I.
For I answered straight and I told you true :
The scaffold was raised for none but you.

"For who has served more faithfully
Than you with your coward's hope ?" said he,
"And where are the others that might have stood
Side by your side in the common good ?"

"Dead", I answer'd ; and amiably
"Murdered", the Hangman corrected me :
"First the alien, then the Jew......
I did no more than you let me do".

Beneath the beam that blocked the sky,
None had stood so alone as I—
And the Hangman strapped me, and no voice there
Cried "Stay !" for me in the empty square.

SAPTAPARNI

আচার্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আমাদের ছাত্রবন্ধু রজতকান্তি মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক পরলোক-গমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করি।

সম্পাদক

SAPTAPARNI

VISVA-BHARATI CHATRA SAMMILANI ANNUAL
VOLUME 7 : 1966

EDITORS :
PARTHAPRATIM DEB : MUKTI KUMAR ACHARYA

PRINTER :

Sri Bidyut Ranjan Basu
Santiniketan Press, Santiniketan

PUBLISHER :

Dr. Kalidas Bhattacharya
Santiniketan, West Bengal

VISVA-BHARATI CHATRA-SAMMILANI : 1965-66

General President—Angshuman Bhattacharya
Executive President—Malabika Sanyal
General Secretary—Satyendra Kumar Pathak
Social Secretary—Chinmay Ray
Asst. Social Secretary—Sumita Mukherjee
Literary Secretary—Parthapratim Deb
Asst. Literary Secretary—Muktikumar Acharya
Games Secretary—Jayanta Chakraborty

Members :

Mira Ghosh
Mukunda Dev Nath
Tapan Kumar Mukherjee
Shiba Prasad Ghosh
Subhas Chatterjee
Rehana Akthar Hannan

FOREWORD

Saptaparni steps into its seventh year in a quiet, competent manner, and this, I feel, is an important event in the life of Visva-Bharati. In course of these six years it has built up a reputation for itself, and the present issue may justifiably claim to have maintained its usual level of excellence.

A students' journal is an indispensable adjunct of university education. It supplements and gives a new significance to what they learn in their class rooms. Prescribed courses of study, and the fright of examinations—which is almost inescapable in the existing set-up—may occasionally inhibit the free play of the mind and the pursuit of learning appears to be a mere routine duty, affording no scope for original thinking or creative expression.

This passing mood of depression is more than counteracted by such extra-academic activities as the regular publication of a journal like *Saptaparni*. It is mainly a forum for students where they can compare notes, view literary or topical problems from their own angles or strive for self-expression. The two well-known genres—the literature of power and the literature of knowledge—are found to receive an identical degree of emphasis, and this, I think, is the correct attitude to be taken by university students to all that concerns them directly or indirectly. Literature, after all, is born of an irresistible urge from within which compels articulation through words or colours or through any other medium. In the absence of that compelling force a discerning student might well subject himself to severe intellectual discipline and make serious attempts to widen the bounds of knowledge. Gurudeva himself thought on these lines and reacted strongly against exclusive importance being attached to literary efforts. Happily, the present issue of the journal is a judicious assortment of writings on subjects of varied interest.

I may refer to yet another useful purpose served by this paper. With the gradual expansion of our university, its constituent *Bhavanas* may in some measure lose direct contact with one another. This is a development which of course the *Chatra-Sammilani* can prevent, and helped by *Saptaparni*, it can very

well achieve its primary object— that is, co-ordination among students of different *Bhavanas.* Organisers have also to come into closer contact with their teachers to receive their help and advice and this results in their personal relationship—a normal and commendable feature of this University— growing stronger and more intimate than usual.

My congratulations are due to all who have worked in a concerted manner to bring out such a satisfying volume. I look forward to a still brighter future of *Saptaparni* and I hope that it will not take long to acquire a place of honour among the student journals of the world.

KALIDAS BHATTACHARYA
Upacharya
Visva-Bharati

ভূমিকা

সপ্তপর্ণী তার সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল শান্ত সহজ অথচ বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে। আমার মনে হয় বিশ্বভারতীর জীবনে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ছয় বৎসরে পত্রিকাটি কিছু খ্যাতি অর্জন করেছে এবং এর বর্তমান সংখ্যায় পূর্বের উন্নত মান যে অক্ষুণ্ণ আছে এ দাবী সঙ্গত।

ছাত্রদের পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ, এ শুধু ক্লাশের লেখাপড়ার পরিপূরক মাত্র নয়, এর বিশেষ একটি তাৎপর্যও আছে। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ভীতি — বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির এই অবাঞ্ছিত, অথচ অনিবার্য জিনিষগুলি অনেক সময় মুক্ত মনের স্বাধীন গতিশক্তিকে পঙ্গু করে এবং বিদ্যার্জন নিছক গতানুগতিক দিনগত কর্তব্যের বিরসতায় পর্যবসিত হয়। সেখানে স্বাধীন চিন্তা কিংবা সৃজন-প্রতিভা বিকাশের অবকাশ সীমাবদ্ধ।

ছাত্রজীবনের সম্ভাব্য সাময়িক অবসাদকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে কেতাবি জগতের বাইরের নানা অতিরিক্ত কার্যকলাপ। সপ্তপর্ণীর মতো একটি পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ সেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পড়ে। এ পত্রটি মূলতঃ ছাত্রগোষ্ঠীর মুখপত্র। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাহিত্যিক অথবা নানা ভিন্ন জাতীয় সমস্যা আলোচনার কিংবা বিচিত্র আত্মপ্রকাশ-চেষ্টার এ যথার্থ ক্ষেত্র। রসসাহিত্য ও চিন্তাধর্মী বা জ্ঞানগর্ভ রচনা — সাহিত্যের এ দুটি শাখাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে দেখতে পাই। মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গীই যথার্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজেরও গ্রহণীয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির মূলে এক অপ্রতিরোধনীয় আভ্যন্তরিক আকুতি সক্রিয় যা মানুষকে ভাষা, বর্ণ এবং আরও বিচিত্র মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশের প্রবর্তনা যোগায়। সেই সংবেগ যেখানে নেই, সেখানেও সৃষ্টি সম্ভব। মেধাবী ছাত্র কঠিন ও সুনিয়ন্ত্রিত মননের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সচেষ্ট হতে পারে। গুরুদেব স্বয়ং এই মনোভাব পোষণ করতেন এবং বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের চর্চায় একান্ত গুরুত্ব আরোপকে কখনও সুনজরে দেখেননি। সুখের কথা, সপ্তপর্ণীর বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয়াশ্রিত রচনার এক বিচক্ষণ সংকলন।

এই প্রসঙ্গে পত্রিকার অন্য এক উপযোগিতার কথা বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান আকৃতির জন্য বিভিন্ন ভবনগুলির পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শিথিল হওয়ার কিঞ্চিৎ আশঙ্কা ঘটেছে। এই বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করতে পারে ছাত্র সম্মিলনী। সপ্তপর্ণীর সহায়তায় বিভিন্ন ভবনের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সুন্দর সহযোগ গড়ে তুলতে পারলে একটি মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। পত্রপরিচালক গোষ্ঠী সাহায্য ও উপদেশের জন্য অধ্যাপক মণ্ডলীর ঘনিষ্ঠতর সংস্রবে আসার ফলে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে

নিবিড়তর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে ওঠায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই শোভন সংখ্যাটি প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা একযোগে কাজ করেছেন তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন জানাই। সপ্তপর্ণীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক এবং অচিরে বিশ্বের ছাত্রপরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে এর একটি সম্মানিত আসন গড়ে উঠুক — এই কামনা করি।*

কালিদাস ভট্টাচার্য
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

* ইংরেজী ভূমিকাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিশ্বভারতী। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি — (সঃ সঃ)

সম্পাদকীয়

সপ্তপর্ণীর সপ্তমবার্ষিক সংখ্যার প্রকাশে নানাকারণে দেরি হল। সেজন্য আমরা দুঃখিত। প্রকাশনের কাজে নানাভাবে বহু শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ছবি ও লেখা দিয়ে যে সকল ছাত্রছাত্রী সপ্তপর্ণী সাজিয়েছেন—তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতি—

বিনীত

সম্পাদক

শান্তিনিকেতন

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

সূচী

ILLUSTRATIONS :

Mastermasai

Bipul Kanti Saha

Uttarayan

Mukunda Debnath

মনুসংহিতায় কৃষি ও বাণিজ্য

প্রণবানন্দ যশ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুশীলন করলে প্রত্যেকেই এ-কথা স্বীকার করবেন যে—যখন যে জাতিই সভ্যতার চরম শিখরে সমারূঢ় হয়েছেন, সেই জাতিরই সভ্যতা প্রধাণতঃ কৃষি ও বাণিজ্যের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভরশীল। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি না হলে প্রকৃত সভ্যতার সমুদ্ভব হয় না—একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল, পরস্পরসাপেক্ষ., একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয়।

উত্তরে চিরতুষার মণ্ডিত মস্তক অভ্রভেদী হিমালয়, দক্ষিণে সাগরোর্মি বিধৌত কণ্যাকুমারী এবং পূর্ব ও পশ্চিম সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের বিচিত্র দেশনিকরের ভূভাগনিচয়ে আবহমান কাল থেকে উদ্ভিজ্জ, খনিজ প্রানিজ প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। পুরাণকারগণ বলে গেছেন যে এই ভূ-খণ্ডে বাস করেন 'ভরত-সন্ততি' অর্থাৎ ভারতবাসী।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

কালের পরিবর্তনশীল প্রভাবে এবং উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতিনিচয়ের আক্রমণের ফলে রত্নগর্ভা ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্য সুখ থেকে বঞ্চিত হলেও আজও তাঁর 'সুজলা সুফলা-শস্যশ্যামলা' রূপের পরিবর্তন হয় নাই।

একথা অস্বাকার করার কোন উপায় নাই যে, রাজ্যবিপ্লব বা রাষ্ট্র পরিবর্তনের সহিত আখ্যানময় ইতিহাসাদি গ্রন্থের ন্যায় পৃথক পৃথক পুস্তকাকারে লিখিত কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ বিবরণ আমাদের জানা না থাকলেও প্রাচীন গ্রন্থগুলি— বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, নীতিশাস্ত্র, কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা উপাখ্যান ইত্যাদি এবং বৈদেশিক জাতিনিচয়ের গ্রন্থাবলী, এবিষয়ে গ্রন্থরচনায় বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল গ্রন্থে যে উন্নত এবং সমৃদ্ধ সমাজচিত্র এবং নগর ও রাজধানীর যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রকৃষ্টরূপে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। কৃষি এবং বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য সম্ভব নয় আর অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় না হলে রাষ্ট্র ও সমাজের তখনকার যে রূপ দেখা যায় তা সম্ভব হ'ত না।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। একথা সুদূর অতীতের ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র রচয়িতাগণ যেমন বলেছিলেন—আজও বিংশ শতাব্দীতে বড় বড় অর্থনীতিবিদরাও

সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন। যা হোক, এ প্রবন্ধে সময়, তারিখের ঠিকুজী আলোচনা না করে আমরা ধরে নেব যে মনুসংহিতার সমস্ত অধ্যায় এক সঙ্গে লেখা হয় নাই। এর বিভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং সেই সময়ের দূরত্ব আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে খৃঃ ৪০০ সালের মধ্যে।

যে অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে জাতিবিভাগ সম্পন্ন হয়েছিল তৎকালে কৃষি-বাণিজ্যবৃত্তির আবশ্যকতা ও সমাদর ছিল, নতুবা বানিজ্যোপজীবী বৈশ্যজাতির উৎপত্তি হতনা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরা সম্মানিত ও বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁরা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হতেন। সমাজের মধ্যে প্রত্যেক জাতিরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। কৃষক বা বণিক শ্রেণীকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করা হতনা বরং তাঁরা সমাজে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মনুর মতে রাজা অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞের কাছ থেকে নিয়মিত বার্ত্তা বা কৃষি বানিজ্যাদি বিদ্যা শিক্ষা করতেন।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চলোকতঃ॥

মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক।

এই বার্ত্তা শাস্ত্র কী? এ-সম্বন্ধে কামন্দকীয় নীতিসারে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর মতে—"পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তাণুজীবিণাম্।" সুতরাং পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থাদি সমন্বিত শাস্ত্রের নামই বার্ত্তা। এই শাস্ত্র বৈশ্যদিগের জ্ঞাতব্য। মনু এই বার্ত্তা কথার উল্লেখ করেছেন এবং রাজাকে তা শিক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষির প্রসার করাই ছিল রাজার কাম্য। তিনি প্রজাদের নানারকম সুবিধাসুযোগ দেবেন যাতে তারা বিনাবাধায় অকর্ষিত জমি কর্ষণ করতে পারেন। ভারতের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তৎকালের কৃষকরা বলদদ্বারা চাষাবাদ করতেন। ঐতিহাসিক জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কৃষির উন্নতিকল্পে ক্ষত্রপ রাজা মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন সুদর্শন হ্রদ সংস্কার ক'রে, বিনা জলকরে, কৃষকদের সেচ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কৃষকদিগকে অগ্রিম বীজ সরবরাহ করবে এবং উৎপন্ন শস্য থেকে তার প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা ছিল।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা মনুসংহিতার আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করতে পারি যা থেকে বুঝবো যে কৃষি সম্পর্কে মনু কতখানি সচেতন ছিলেন। তিনি রাজার বাসস্থান বা রাজধানীর জন্য এমন একটি জায়গার নির্দেশ দিয়েছেন যা হবে কৃষি-প্রধান অর্থাৎ জাঙ্গলদেশ। মনুর ভাষায়—

জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্য প্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ ॥

মনু, সপ্তম অধ্যায়, ৬৯ শ্লোক।

এই জাঙ্গলদেশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুল্লুকভট্ট বলেছেন—"অল্পোদকতৃণো যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ। স জ্ঞেয়ো জাঙ্গলো দেশে বহু ধান্যাদি সংযুক্তঃ।" অর্থাৎ যেখানে জল এবং তৃণ অল্প, বায়ু ও প্রচুর রৌদ্রের উত্তাপ এবং বহুধান্যাদিশস্যোৎপত্তি সম্পন্ন সেরূপ দেশে রাজা বাস করবেন। এছাড়া, কৃষিকার্যের বহুল প্রচারার্থে রাজা তাঁর কর্মচারীদের মাসিক বেতন অর্থের পরিবর্তে জমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। বিনা করে যে অনাবাদী জমি আবাদ করার জন্য দেওয়া হতো এর একমাত্র কারণ কৃষকদের উৎসাহ দান করা। কৃষিকার্য কেবলমাত্র যে বিশেষ কোন জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়—যে কোন বর্ণ এ বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন। ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করতে সক্ষম না হন তাহলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন এবং স্বধর্ম বা ক্ষত্রিয়ধর্ম দ্বারা জীবিকা চালাতে অক্ষম হলে কৃষিগোরক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি অনুষ্ঠান করবেন। সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ, শিলালেখ পাঠ করে জানা যায় তৎকালীন আর্থিক প্রাচুর্য্যের কথা—এর একমাত্র কারণ কৃষির বহুল প্রসার। কৃষির এই বহুল প্রসারই ছিল বাণিজ্যের অনুপ্রেরণা।

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ'—এ কথা শুধু আজ নয়, সুদূর অতীতেরও ভারতবর্ষীয়দের মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই তাঁরা কেবলমাত্র দেশের মধ্যেই বাণিজ্য নিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ সাধন করেছিলেন। স্থলপথ এবং জলপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং বিদেশী দ্রব্য দেশে ও দেশীয় সম্পদ বিদেশে আদান প্রদান করতেন। বণিকদের 'সাগরপাড়ি' দেওয়ার প্রসঙ্গে মনু বলেছেন—

সমুদ্রযান কুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তিতু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রাধিগমং প্রতি ॥

মনু, অষ্টম অধ্যায়, ১৫৭ শ্লোক।

উপরিউক্ত শ্লোকটি থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে সেই সময় সমুদ্রগমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল ও লাভালাভদর্শী বণিকেরাই বাণিজ্যহেতু 'সমুদ্র পাড়ি' দিতেন? প্রাচীনতর গ্রীকলেখক এবং সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তখন শুধু কৃষির প্রচলনই প্রসার লাভ করে নাই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কুটির-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। বিদেশে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ছিল প্রচুর; স্বভাবতঃ বিদেশীদের এই চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণও হয়েছিল ততোধিক দ্রুত তালে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক যথেষ্ট ঘণীভূত হয়েছিল। পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এতখানি উন্নতি সাধন করা সম্ভব ছিল না। এ কথা সত্য মনুসংহিতায় তৎকালীন পথঘাট সম্পর্কিত কোন বিবরণ দেওয়া না থাকলেও ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থকে যে সময়ের রচনা বলে অভিহিত করেন সে সময় ভারতের সহিত বিদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ।

স্থলপথের বহির্বাণিজ্যের পথছিল চীন থেকে ভারতের উত্তরে ব্যাকট্রিয়া এবং এই ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বসীমান্তস্থিত পালমিরা পর্যন্ত। এই পথের নাম ছিল "সিল্করুট্" বা রেশমের পথ। তক্ষশিলা থেকে একটি পথ উত্তর পশ্চিমে গিয়ে বহ্লীকদেশে বা ব্যাকট্রিয়ায় মিলে ছিল। তাছাড়া উত্তরাপথকে সংলগ্ন করার জন্য পূর্বে তাম্রলিপ্তি থেকে একটি প্রশস্ত এবং ছায়া সংকীর্ণ পথের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটি একেবারে মথুরা দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত প্রসারিত একটি পথের কথা জানা যায়। এইসকল পথই দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সংযোগস্থল হিসাবে উজ্জয়িনীর গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

মনুর সময় কেবলমাত্র বিপদসংকুল স্থলপথের কথাই জানা যায়, তাই নয়— জলপথের উল্লেখও পাওয়া যায়। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস' (Periplus of the Erythracan Sea) নামক গ্রন্থ থেকে এদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তাঁর লেখা বই-এর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বড় বড় বন্দর এবং গঞ্জের নাম পাওয়া যায়। আধুনিক 'এজেন্সি' ব্যবস্থার অনুরূপ বন্দোবস্ত করে তৎকালীন এই সমস্ত বন্দর ও গঞ্জে গ্রীক-রোমান সওদাগরদের প্রতিনিধিরা বসবাস করতেন। ব্রোচ্ বা ভৃগুকচ্ছ ছিল এদেশ থেকে রপ্তানির সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি। ওজেনে বা উজ্জয়িনী ছিল দেশের ভিতর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। এছাড়া, 'পেরিপ্লাসে' উল্লেখিত Damirica বা দক্ষিণাপথের প্রধান প্রধান বন্দরগুলির নাম আক্ষরিকভাবে প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করে দেওয়া হল :

Barbaricum, Barygaza, Suppara, Caliena, Semylla, Mandagora, Palaepatme, Malizigara, Byzentium, Naura, Tyndis, Muziris, Korkai, Puhar, Poduca, Sopatma, Kantakasila, Palore ইত্যাদি। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নিবন্ধে 'পেরিপ্লাসের' প্রমাণ একান্তই প্রয়োজনীয়। ভারততত্ত্ববিদ্‌দের নিকট 'পেরিপ্লাস' একটি অমূল্য সম্পদ।

শুধুমাত্র সমুদ্রযাত্রার উল্লেখই নয়, দশম অধ্যায়ের দু-একটি শ্লোক আমাদের

স্মরণ করিয়ে দেয় যে মনুর সময়েও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। চীন, কম্বোজ, সিংহল, রোম, আরব, জাভা, সুমাত্রা, বর্ণিও এবং আরও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল দেশের সহিত ভারতের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটেছিল। যে সকল সামগ্রী দেশে ও বিদেশ আদান প্রদান হত মনুসংহিতার মধ্যে তার বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকলেও পেরিপ্লাস এবং প্লিনির'র বিবরণী (Natural History) এ-বিষয়ে নিখুঁত ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে গেছেন। ভারত থেকে রপ্তানি হত বস্ত্র, কারু, দারু প্রভৃতি শিল্পজাত সামগ্রী ও মসলাপাতি, রেশম এবং বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর ইত্যাদি, অপরপক্ষে বর্হিদেশ থেকে আমদানি হ'ত তামা, টিন, প্রবাল, রৌপ্য-দ্রব্য, সোনা ইত্যাদি। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায় রাজান্তঃপুরের জন্য সুনির্বাচিত যুবতী নর্তকী এবং সুগায়ক বিদেশ হ'তে আমদানি হ'ত। মসলাপাতি এবং বিলাস-দ্রব্য রপ্তানি করে তৎকালীন বণিকগণ এত বেশী বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন যে অর্থের অভাবে রোম সাম্রাজ্য পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্লিনি বলেছেন রোমসাম্রাজ্যে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পজাত দ্রব্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রোমের বস্ত্রশিল্পের প্রায় অচল অবস্থা হয়ে পড়ে। তাই এই সমস্যার সমাধানহেতু রোমান কর্তৃপক্ষ আইন করে বিলাস দ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন।

আভ্যন্তরীন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনু যে সকল নিয়মকানুনগুলির উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক, বিশেষ করে বাণিজ্যিক বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় তার মূল্য অসামান্য। বণিকদের বৃত্তিরক্ষা এবং বাণিজ্য ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা সকল মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অতি মনোরমভাবে বর্ণিত আছে।

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধণম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধান্ৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়-বিক্রয়মেবচ॥

মনু, নবম অধ্যায়, ৩৩১-৩৩২ শ্লোক।

বৈশ্যজাতি দ্রব্যজাতের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যগুলির বিক্রয়দ্বারা লাভালাভের বিষয়, গবাদিপশুর পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যগণের বেতন, বিবিধপ্রকার ভাষা, দ্রব্যগুলির স্থানযোগ অর্থাৎ কোন দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করলে বহুকাল থাকে, তদ্বিষয়ে এবং ক্রয়বিক্রয়ের রীতি অবগত হবেন। মনুর এ-দু'টি শ্লোক থেকে তৎকালীন ব্যবসার একটি সুস্পষ্ট রূপ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোন বিশেষ গ্রন্থ রচিত না হলেও ধর্মশাস্ত্র

রচয়িতাদের রচনা সে-স্থান পূরণ করার দাবী রাখে। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে বর্তমানকালের ব্যবসা বাণিজ্যের কাঠামো প্রাচীন ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য-নীতির পরিপূরক।

রাজার সদিচ্ছা এবং অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতো। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বণিকদের যেমন প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত, বিনিময়ে রাজা তাদের নিকট থেকে কর গ্রহণ করতেন। পশু এবং স্বর্ণের লভ্যাংশ থেকে ১/৫০ ভাগ এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর লভ্যাংশের ১/৬ ভাগ রাজা কর হিসাবে আদায় করতেন। এছাড়াও বণিকরা যাতে চোরা কারবার বা কালোবাজারি না করতে পারে তার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র কর্তৃক করা হ'ত। এ বিষয়ে মনু রাজাকে নির্দেশ দিয়েছেন :

"বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্ব কর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥"

মনু, অষ্টম অধ্যায়, ৪১৮ শ্লোক।

অর্থাৎ 'রাজা যত্ন-সহকারে বৈশ্য ও শূদ্র জাতিকে স্ব স্ব কার্য করাইবেন, যেহেতু, ঐ উভয়ে স্বকার্য্যচ্যুত হইয়া অশাস্ত্রীয় উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিয়া অহঙ্কারে জগৎকে আকুল করিতে পারে।' রাজ্য থেকে শঠ, প্রতারক এবং হঠকারিতা দূরীভূত করার জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর রাজকর্মচারীগণ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বণিকদের 'প্রস্থ দ্রোনাদি পরিমাণ ও তুলামান' প্রভৃতি সামগ্রী পরীক্ষা করতেন। যে কোন দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার রীতি ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি পথে শ্রেণী বা সঙ্ঘের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক শিলালিপি থেকে প্রায় প্রত্যেক শিল্পেরই একাধিক শ্রেণী বা সঙ্ঘ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা রাজকোষ থেকে অর্থ সরবরাহ ক'রে এই সকল শ্রেণীর সমৃদ্ধি এবং উন্নতি কামনা করতেন। বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরদের যে সঙ্ঘ বা শ্রেণী ছিল তার মাধ্যমে শিল্পশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। আমাদের মহাকাব্যদ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ অলোকপাত করে। প্রসঙ্গক্রমে মনু বলেছেন :

জাতিজানপ্রদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥

মনু, অষ্টম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

তাছাড়া, এই শ্রেণীর নিয়মকানুন সম্পর্কিত যে বিবরণ আছে তা নিঃসন্দেহে বর্তমান "ট্রেড-ইউনিয়ন"-এর কার্যাবলীর ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সঙ্ঘের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। যদি কোন শ্রেষ্ঠী অর্থলোভবশতঃ

নিয়মভঙ্গ করতেন তাহলে রাজা তাকে সে রাজ্য হতে বহিষ্কৃত করতেন। এই সকল শ্রেণী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের বহুল প্রসার করা এবং ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করা। বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরিণ বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘের ভূমিকা অতুলনীয়। এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই প্রাচীন ভারতের বণিক সম্প্রদায় দেশ হতে দেশান্তরে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের ডালি পৌঁছিয়ে দিতেন। তৎকালীন ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এত বেশী হয়ে ছিল যে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাণিজ্য ক্ষেত্রে কম অগ্রণী ছিলেন না।

পূর্বালোচিত বিবরণ থেকে পরিশেষে একথা অনুমান করা ভুল হবে না যে মনুতে যেমন হিন্দুদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিধান রয়েছে, তেমনি প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্যের এতাদৃশ উন্নতি লাভ হয়েছিল যা মানবধর্মসংহিতাতে তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা নিবদ্ধ করার নিতান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। মনুর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ভারত ইতিহাসে ক্ষণস্থায়ী নয়—পরবর্তীকালেও আমরা তাঁর চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি বিভিন্ন 'রাজা-উজীরে'র আমলে দেখতে পাই।

ডায়েরীর এক পাতা

বিশ্বরঞ্জন প্রামাণিক

কোন্ সকালে দুলেছে মোর প্রাণ
তোমার পরশ লেগে—

তোমার অনুভূতির স্পর্শ মোহপাশে জড়িয়ে ধরে আমায় মাতাল করেছে, বুঁদ করেছে। টল্‌তে টল্‌তে ভেবেছি কতদিন, ভাবনার ছোঁয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব দূরে, বহু দূরে। কিন্তু—কিন্তু তা পারিনি। তোমার সুরের রেশ আমাকে নেশা ধরিয়েছে, আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। সে সুরের ঝঙ্কার, রঙের ঝর্ণা, মনমাতানো রূপে মন ডুবিয়ে যখন চাইলাম তখন তুমি আমার দিকে চেয়ে। তখন কি তোমার কোমল পাপ্‌ড়িটুকু একটুও কেঁপে উঠেনি, পাতায় ঢাকা নিজেকে সরিয়ে একটু কি তুলে ধরোনি? মৃদুমন্দ বাতাসে কখনও বা পাতার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছ, সব ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হল—এই বুঝি অন্ধকার হয়ে গেল, সমস্ত সৌন্দর্য বুঝি চুরি হয়ে গেল, ব্যর্থ হ'ল সে পূজার আরতি।

ভ্রমরের দল ফিরল বনে বনে। কি নিষ্ঠুর এরা। এরা তোমার সমস্ত মধুর সত্তাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করে ধুলায় লুণ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু—আমি তা হতে দেবো না। ঘরের কোণে বসে বসে মনের রূপ, রং দিয়ে যে পূজার ডালি এতদিন সাজিয়ে রেখেছিলাম, তাকে আমি অপবিত্র হতে দেবো না। তাই, ছুটে বেরিয়ে এসেছি তোমার এই আঙিনায়।
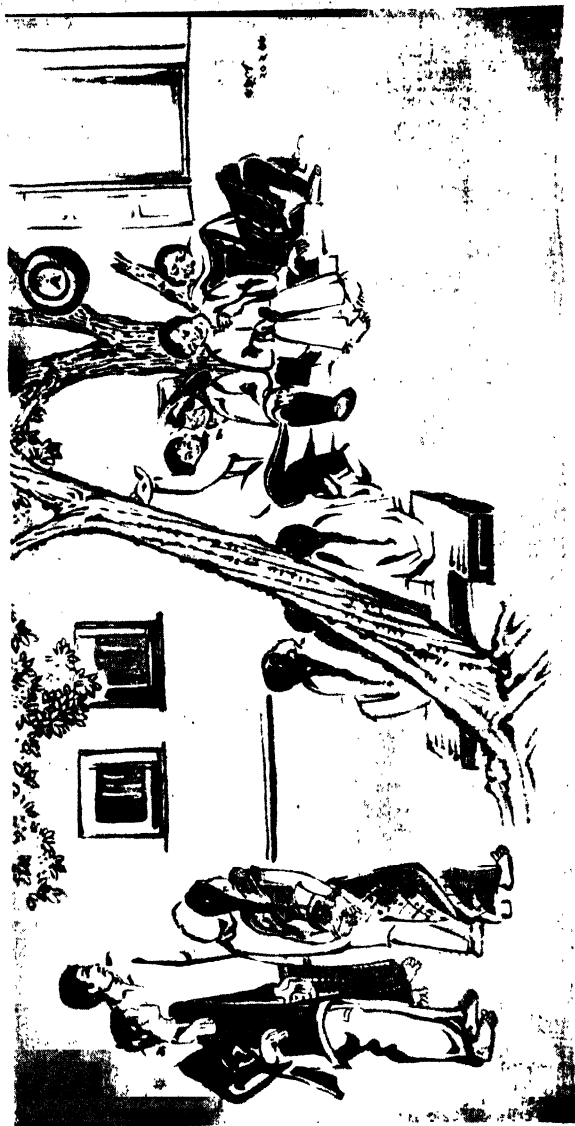
Gossip

Rajul Dhariwal

Musicians

Paresh Chattarjee
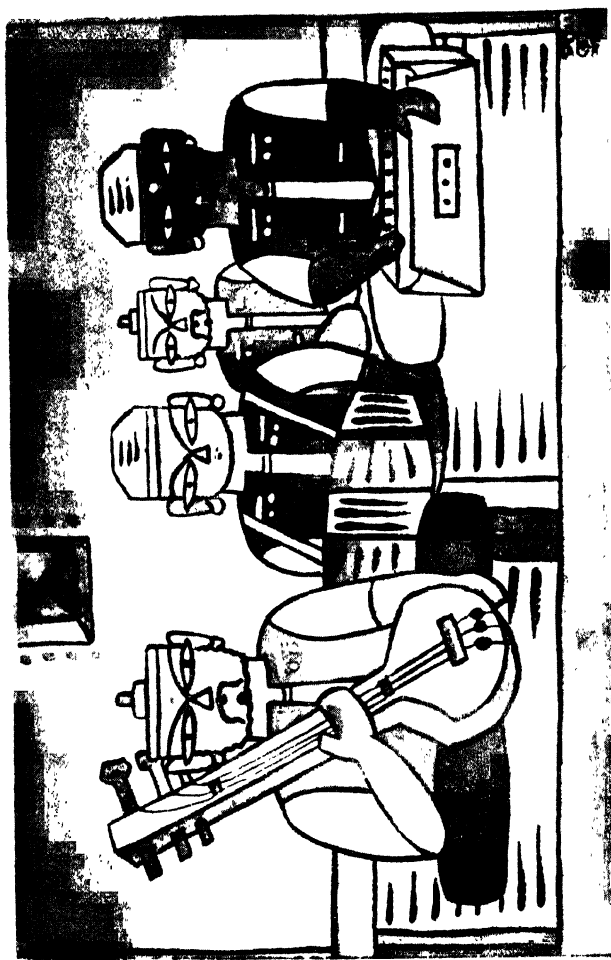
গড়মান্দারণ

বাসুদেব ভক্ত

হুগলী জেলার আরামবাগ শহরের দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অথবা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরের মাত্র চার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গড়মান্দারণ একটি ভগ্ন গ্রাম। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসস্থল হিসাবে গ্রামটির একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। কথিত আছে—বঙ্কিমচন্দ্র যখন আরামবাগের ডেপুটি ছিলেন, তখন গড়মান্দারণের নিকটবর্তী কোনও একটি গ্রামে তিনি একটি তদন্ত কার্যে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ই তিনি গড়মান্দারণের ভগ্ন বৈচিত্র দেখেন এবং এখানকার প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক সংহতি লক্ষ্য করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার প্রয়াস পান। আরও প্রবাদ যে, তিনি নাকি কামারপুকুরের ডাক বাংলোতে বসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার কথা প্রথম ভাবিয়াছিলেন।

আমি কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাবিদ্যামহাপীঠে পড়িবার সময় গড়মান্দারণ পরিভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। গড়মান্দারণে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।

প্রথম কামারপুকুরে আসিয়া আমি বা আমার বন্ধুদের অনেকেই গড়মান্দারণ সম্পর্কে ঐরূপ প্রবাদ শুনিলাম। তাই আমরা জনদশেক সতীর্থ বন্ধু একদিন ঠিক করিলাম যে, সে বছর পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার আগেই একদিন গড়মান্দারণ ভ্রমণ করিয়া আসিতে হইবে। আমাদের এক সতীর্থ বন্ধুর বাড়ী কামারপুকুরের নিকটেই। সে ইতিপূর্বে অনেকবার গড়মান্দারণ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। আমরা তাহাকেই দলনেতা নির্বাচন করিয়া যথারীতি ভ্রমণসূচী তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম।

পূর্বপরিকল্পনা মত আমরা দশজন নির্দিষ্ট দিনে গড়মান্দারণ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। কামারপুকুর ডাকবাংলো হইতে যে সরু মেঠো রাস্তাটি মাঠের মধ্য দিয়া গড়মান্দারণের দিকে গিয়াছে—সেই রাস্তা ধরিয়া। রাস্তা বেশ সুবিধার নয়। তখন আশ্বিন মাসের শেষ। তখনও রাস্তায় কাদা; কোথাও কোথাও জল জমিয়াছিল। তাই আমাদের পায়ে জুতা ছিল না, হাতে ছাতা ছিল এবং পরণে ছিল অতি সাধারণ পোষাক। আমাদের নিজেদেরই মনে হইতেছিল, আমরা যেন প্রাচীনকালের কোনও এক পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর দল। আর সত্যসত্যই তীর্থ-যাত্রীর মত সেইদিন আমাদের মন ছিল বিচিত্র কৌতুহলে ভরা। প্রতি পদক্ষেপে আমরা যেন কি এক অভিনব আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। ভাবাবেগে অনেকেরই

কণ্ঠ ভরিয়া সঙ্গীত উপচাইয়া উঠিতে ছিল। আর মাঝে মাঝে আমাদের দলনেতা বন্ধুটির মুখে গড়মান্দারণ সম্পর্কে প্রচলিত রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি শুনিয়া তীর্থযাত্রীর তীর্থস্থানের মতই গড়মন্দারণও আমাদের কাছে অধিকতর জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়িতেছিল।

সীমাহীন নির্জন মাঠের মধ্য দিয়া আমাদের সরু রাস্তা। রাস্তার দুইধারে—"কচি ধানগাছে ক্ষেত ভরে আছে; হাওয়া দোলা দেয় তারে—"। আর সেই ক্ষেতভরা সবুজের উপর আশ্বিনসূর্য্যের সোনালী রোদ পড়িয়া সারা মাঠ যেন ঝলমল করিতেছে। সেই মাঠের মাঝখানেই গড়মান্দারণ। তাই আমরা মাত্র মাইল তিনেক আসিতেই আমাদের দলনেতা বন্ধু আঙুল বাড়াইয়া দেখাইল—ঐ যে গড়মান্দারণ। আমরা দেখিলাম দূরে দিকচক্রবালের কোলে শ্যামল বনানীর উপর নীল আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। মনে বিপুল পুলক; আমরা দ্রুতগতিতে আগাইয়া আসিতেছি। পথে দেখিলাম একটি জরাজীর্ণ নদীর উপর একটি ভাঙা কাঠের সেতু। আমাদের দলনেতা জানাইল নদীটির নাম আমোদর; ইহা গড়মান্দারণের ভিতর দিয়া গিয়াছে। আমোদরের পূর্ব তীর ধরিয়া যে সরু রাস্তাটি গড়মান্দারণের দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা আগাইতে লাগিলাম। যতই আগাইয়া আসি, ততই শ্যামল বনানী স্পষ্টতর হইতে লাগিল; আর ততই আমাদের আনন্দ বাড়িয়া গেল।

আনন্দে প্রায় অধীর অবস্থায় আমরা ধীরে ধীরে গড়মান্দারণে পৌছাইলাম। চারিদিকে শুধু মাটির ঢিবি আর ঢিবি; আর তাহার উপর গাছপালার ঘন জঙ্গল জমাট হইয়া আছে। চারিদিকে মাটির ঢিবি পরিবেষ্টিত এই গ্রামটিকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গ। যাই হোক্, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম—বিরাট গোরস্থান (কবর ভূমি); এখানে সেখানে ছোট বড় সমাধি মন্দির; কোথাও বা মসজিদ্। আমাদের বন্ধু দেখাইল সামনেই পাঠান পল্লী। বিরাট আমবাগানের মাঝে মাঝে ছোট ছোট চালাঘর। এখানেই পাঠান মুসলমানেরা বাস করেন। পল্লীতে আসিতেই কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হইল। তাহাদের কৃষ্ণ বর্ণ দীর্ঘ দেহ, বিস্তৃত বক্ষ এবং তীক্ষ্ণ চক্ষু দেখিলে মনে হয় এঁরা উপযুক্ত দুর্গরক্ষীই বটেন। এঁরা খুবই ভদ্র। অতিশয় আগ্রহ সহকারে এঁরা গড় মান্দারণের কয়েকটি স্থানের ঐতিহ্য আমাদের বুঝাইয়া বলিলেন এবং গড়মান্দারণের বিশেষ আকর্ষণযোগ্য দুটি গড় দেখিতে যাইবার রাস্তাটি আমাদের দেখাইয়া দিলেন।

পাঠান পল্লীর দক্ষিণ প্রান্তেই শ্যামসুষমার পরমাধার দুটি গড়—যাহারা তাহাদের অমুচ্চ শ্যামল শীর্ষ উর্দ্ধে তুলিয়া নীল আকাশকে যেন হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে।

গড় দুইটির একটি অপরটি অপেক্ষা অনেক বড়। বড়টিকে 'বড় গড়' এবং ছোটটিকে 'ছোট গড়' বলে। এই দুইটি গড়ের মধ্য দিয়া শৈবাল জর্জরিত আমোদর নদ আজও চলিয়াছে আপনার আপন ছন্দে তার পুণ্য সাগরতীর্থের সন্ধানে। দুইটি গড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহমান আমোদরের দৃশ্য সত্যই হৃদয়স্পর্শী!

আমোদর পার হইয়া আমরা বড় গড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানটি অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ—কুল, সেঁকুল, ওকড়া, আপাঙ্‌ ও আরও অনেক কাঁটা গাছের ঘন বনে পরিপূর্ণ। তাহারই মধ্য দিয়া একটি সরু রাস্তা উপরের দিকে উঠিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই পরিভ্রমণকারীরা উপরে উঠিয়া থাকেন। আমরাও সেই রাস্তা ধরিয়া ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু এ স্থানটি অজস্র রক্তপিপাসু মশা ও জোঁকের আড্ডা। আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও ইহাদের আক্রমণ এড়াইতে পারিলাম না। অনেকেই ইহাদের কিছু কিছু রক্ত দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইল। এই সময় আমাদের আরও ভয় হইতেছিল যদি বিষধর সাপে তাড়া করে! যাই হোক্, আমরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিলাম। তাহা ছাড়া বড় গড়ের সুউচ্চ শীর্ষটি তখন আমাদের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে আমাদের যেন ওখানে উঠিতেই হইবে।

যতই উপরে উঠা যায়, ততই কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশ ছাড়াইয়া তাল, খেঁজুর, শিমুল. পাঁকুড়, কদম্ব ও তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষের বনদেশে আসা যায়। গড়টির কটিদেশে অবস্থিত এই শ্যামল বনরাজি উদ্ভিন্ন সেবিনা তরুণীর কটিদেশস্থ মেখলার ন্যায় গড়টিকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য যে কত অনবদ্য, কত নিখুঁত তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই সৌন্দর্য্য একদিন এক বিচারকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র সৃষ্টি করিয়াছিল।

আরও উপরে উঠিলে মাটির আস্তরণে অজস্র ইট ও পাথরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। সরু সরু লতা তাহাদের উপর জাল বুনিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সব ইটের সারি ও পাথরের টুকুরো দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানে এককালে কোন ও প্রাসাদ বা রাজবাড়ী ছিল।

শীর্ষটি বৃক্ষহীন, প্রস্তরময়। শুনা যায়, বহু পূর্ব্বে এই শীর্ষে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ তাহার অসংখ্য ডালপালা ও ঝুরি দিয়া গড়টিকে মুকুট পরাইয়া ছিল। কিন্তু তাহা আর আজ নাই। রাজা বীরেন্দ্রসিংহ মুকুট ছাড়িয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। পাঠানের শঠতায় আর তাঁহাকে মুকুট পরিতে হয় নাই। বোধ হয়, এই নিদারুণ শোক স্মৃতিকেই মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিবার জন্য প্রকৃতিদেবী গড়টিকেও মুকুটহীন রাখিয়াছেন!

যাহাই হউক, এই গড়টির শীর্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকে প্রকৃতির যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিলাম তাহা বোধ করি সারা জীবনে ভুলিব না। চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত সীমাহীন প্রান্তর। এই প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে না। শরতের বঙ্গলক্ষ্মী তাহাতে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ফুল ফলভারে অবনত ধান্যশীর্ষগুলি মৃদুমন্দ সমীরণে অবিরাম দুলিয়া দুলিয়া বিধাতার চরণে যেন প্রণাম নিবেদন করিতেছে, আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে পাপিয়া শালিকের দল মনের আনন্দে গান গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতেছে। আর নীল আকাশের কোলে উড্ডীয়মান সারসের দল নিরলস পক্ষসঞ্চালন করিয়াও বুঝি এই সীমাহীন প্রান্তর পাড়ি দিতে পারিতেছে না।

বহুদূরে এই সীমাহীন প্রান্তর মাঝে কয়েকটি গ্রামের নিকট (কাঁঠালী, কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম) একবার যেন ধরা দিয়াছে। ঐ গ্রামেই আছে শৈলেশ্বরের মন্দির— যে মন্দিরে পূজা দিতে গিয়া জলঝড়ের রাত্রিতে শিবিকাবাহকদের দ্বারা পরিত্যক্ত বিমলা ও তিলোত্তমাকে রাত্রির প্রহর গনিতে হইয়াছিল···। ঐ গ্রামের পরে আবার প্রান্তর (বর্ত্তমান ভিখদাম মাঠ)। সীমাহীন প্রান্তর। যে সীমাহীন প্রান্তরের নির্জন শান্তি ভঙ্গ করিতে গিয়া অশ্বারোহী জগৎসিংহের কাছে সহসা নিদাঘের নৈশ ঝটিকা বর্ষণ সহকারে নামিয়া আসিয়াছিল এবং অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঐ শৈলেশ্বরের মন্দিরেই আসিতে হইয়াছিল এবং শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে তিলোত্তমাকে প্রথম দর্শন দিয়া দুর্গেশনন্দিনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন।

দূরে-আরও দূরে-বহুদূরে যেখানে নীল আকাশ সবুজ পৃথিবীকে অবিরাম চুম্বন দিয়া রূপের সহিত অরূপের মিলন ঘটাইতেছে; যেখানে মিলন বাসরের পল্লব কুঞ্জে বসিয়া কোকিল দম্পতি আপন মনে মিলন গান গাহিতেছে; যেখানে দিকচক্রবালের শ্যামল বনানীর উপর শরৎসূর্য্যের সোনালী রশ্মি অবিরাম আল্‌পনা আঁকিতেছে—সেইখানেই বুঝি এই প্রান্তরের শেষ।

হাওড়ার পুলে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দুইতীরের যান্ত্রিক সৌন্দর্য্য অনেকবার উপভোগ করিয়াছি; আর মান্দারণের গড়ে দাঁড়াইয়া এই যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করিলাম—এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান; যে ব্যবধান বিশ্বকর্মার টুকিটাকি আর ব্রহ্মার চিরসুন্দর সৃষ্টিরাজির মধ্যে।

উৎস

দিলীপকুমার মণ্ডল

জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ মানুষকে জড়ায়। আর সেই আপন হাতে জড়ানো বাঁধন নিজের শত চেষ্টা দিয়েও একদিন আর খুলতে পারে না। বাঁধন তখন তাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মারে। "তোমার আমার যে যোগাযোগ হঠাৎ ঘটে গেল তার কারণ কি অজ্ঞাত?"—এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। আমরা দুজন চুপ করে থাকি। কিন্তু কথা কয় বুদ্ধিবাদীরা। ওরা ব্যাখ্যায় নামে, আর নাম দেয় হাজারটা। ত্রিকোণ কাঁচের মধ্য দিয়ে এ যেন ওদের সাত রং দেখা। রং, তুমি আমি দুজনেও দেখি। কিন্তু সে দেখা তো রঙের বিশ্লেষণ নয়—আমরা দেখি রামধনুকে—দেখি তার পিছনের নীল পটকে। প্রত্যক্ষ করি পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের সঙ্গে সমস্ত জিনিষের মিতালীকে। পৃথিবীটা কাছে আসে—মনে আপন হয়ে বাজতে থাকে সমস্ত কিছু। অথচ ওরা সময় কাটায় শুধু রং আর নাম নিয়ে। এর পিছনে যে বিরাট মিতালীর জলছত্র তা ওদের চোখে পড়ে না।

আবার যখন তুমি চলে যাও—তখন মৃত্যু ঘটে পৃথিবীটার। তখন ওরা সেই হিসাবীর দল আর একবার মেলাতে বসে আমাদের হিসাবকে। আর এদিকে তোমার দূরত্ব আমাকে আরও পাইয়ে দেয়। ওরা তা বোঝে না তাই চুপ করে থাকি। ওরা জানেনা যে তুমি জেগে ওঠো তখন জগতের সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একই জিনিষের কি চমৎকার ভিন্ন ফল। কিন্তু তখন সেই পাওনা শুধু হাতে আসে না—বয়ে আনে গান। তখন আমি গান গাই। কারণ তোমার পারে আমার সেই হঠাৎ তৈরী করা বাঁধনের স্বীকৃতি পৌঁছে দিতে চাই যে। আর তার খেয়া হয় আমার গান। তুমি পাও কি না পাও জানিনা তবে আমি যে পাঠাই তা সত্যি। সত্যি হত না যদি কিনা সেই বাঁধনের অস্তিত্বটা ভোলা যেতো। কিন্তু পারি না তার কারণ এই যে, ওটার ভিত্তিটা কারণহীন। কারণের উপর গড়া কিছুকে সহজেই কারণের বিচ্যুতি দিয়ে নষ্ট করা যায়—ওটা পারে তার্কিকের দল। যেহেতু ওরা প্রথম থেকে কারণটাই ঘাঁটে। কিন্তু আমি যে অকারণের পথে হাঁটতে হাঁটতে তোমাকে বেঁধেছি। লজ্জা পেতে হয় ওদের প্রশ্নে। কিন্তু উপায় নেই, ওটা মেনে নিই। মেনে নেওয়াটাই জিৎ। তাই বলছিলাম অকারণের এ বাঁধন গড়ে ওঠে অকারণে।

পৃথিবীর ভালো গানগুলোই অকারণের ধন। পৃথিবীর সমস্ত শিল্প সেই অকারণ উৎসজাত। আদম ও ইভ কোটি কোটি বছরের পৃথিবীতে হাজারটা তুমি আমির মাঝ দিয়ে আজো কাছে আসে, দুজন দুজনকে আবিষ্কার করে। আর শিল্পের উৎস

হিসেবে রেখে যায় তাদের অশ্রুর গান। তাদেরই গানের ইতিহাস কবি লিখে রাখেন কথায়, শিল্পী রাখেন মূক পাথরে।

তাই বলছিলাম আমাকে আমি তোমাতে জড়াই অকারণে—প্রশ্ন করো না ওর উত্তর মেলেনা।

স্মৃতি তুমি বেদনার

রেবতীমোহন সাহা

ছেলেবেলায় যাতায়াত ছিল সাঁওতাল পাড়ায়, সমবয়সী এক সাঁওতাল ছেলের সাথে পাতিয়ে ছিলেম মিতালী ; নাম তার ফুলকুমার। এক শ্রেণীর একই বেঞ্চে বসে পড়েছি। সে অনেক দিনের কথা, স্মৃতি তার আব্‌ছা কুয়াশার চাঁদর জড়িয়ে পড়ে আছে অবচেতন স্তরে।

আমি পাশ করে এসেছি শহরে, বড় কলেজে, যে পড়ে রইল স্কুলের গণ্ডীতেই, তারপর ছেড়ে দিয়েছে পড়াশুনো। এখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় মাঝে মাঝে, লম্বা ছুটিতে চলে যাই ওদের বাড়ী। তাস আর সিগারেট দু'ই চলে অবাধে। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে এমন স্বাধীনতা ক'জনেরই বা থাকে, তাই অনেক দিনেও কাটেনি এর আকর্ষণ। বিয়ে না করলেও মিতা তখন সংসারী, আমি গেলে সেদিন ওর ছুটি—বিকেলে দু'জনে গিয়ে বসতেম ডিম্‌ডিমার ধারে, উঁচু উঁচু দুটি পাথরে, সামনে ছুটে চলত শীর্ণকায়া খরস্রোতা নদী, চলায় যেন তার নৃত্যের ছন্দ, যেমনি পাহাড়ী নাম তেমনি অবাধ আনন্দে তার ছুটে চলা। কথায় কথায় গল্প উঠত জমে, মিতার সরল মনের দুয়োরটা সহজেই যেত খুলে—পাশের গাঁয়েই থাকেন বাবুলাল সর্দার, তার মেয়ের নাম চুন্‌কী, ওর মতে সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। আবেগ ভরে বলেই ফেলল, "শেরি গেইন্‌ মেনেটু কানা, চুন্‌কী দ এডিং দুলেড়িয়া" অর্থ করলে দাঁড়ায়—সত্যি বলছি, চুন্‌কীকে আমি খুব ভালবাসি। প্রথম দেখা, ভাললাগা, আর সে ভাললাগাকে ভালবাসায় রূপান্তরের গল্প শোনাল সরল অনাড়ম্বর ভাষায়। হাতে নিশানা করে দেখাল—উঁচু টিলার পাশে সর্ষে ক্ষেতে ফুল ধরেছে বিস্তর, যেন সোনায় সোনায় ছেয়ে গেছে পাহাড়ের একটি কোণ। তার পাশ দিয়ে নদী থেকে উঠে গেছে একটা পায়ে হাটা পথ, কালো পাথুরে মাটির বুক চিরে চুন্‌কীদের আঙ্গিনাতেই তার সীমানা হয়েছে শেষ। নদী তীরের এই জঙ্গলের ধারে মিতে বসে থাকে ধনুক হাতে (পাখী শিকারের ছলনায়); চুন্‌কী আসে ঘড়া হাতে জল নিতে, দেখা হয় প্রায়ই, নির্জনে কথাও হয় অনেক। মনে মনে ওরা দু'জন দু'জনকেই নিয়েছে বেছে, দুর্বোধ্য কি একটা তিথির নাম করে বললে সামনের ফাগুনেই হবে বিয়ে সেই তিথিটারই শুধু অপেক্ষা।

তারপর মাস তিনেক গেছে কেটে। কাজ নিয়ে যেতে হলো দূরে, অলস মন্থর দিনের মায়া কাটিয়ে, এ ডুয়ার্স ছাড়িয়ে একেবারে যন্ত্র দানবের সংসারে। ভালো লাগল না মিনিট ঘণ্টা মাপা দিন গুলো, আর মুখোস পরা লোকগুলোকে, তাই ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হলো আবার এই উঁচু নিচু ঝোপঝাড়ে ঘেরা ডুয়ার্সে। মনে হলো মিতার কথা, যাই যাচ্ছি করে বৃথাই কেটে গেল একটি মাস। এই সে দিনের

কথা, ফাগুনের প্রথম দিন, বাতাসে লেগেছে একটু উদাসী হাওয়ার স্পর্শ, সকালের কাঁচা রোদেও যেন কিসের একটু আমেজ। সাইকেল চলছে চা-বাগান, শালবন আর ছোটোখাটো চড়াই-উৎরাইয়ের পথ ধরে। দেখতে দেখতে বেলা এল ঠিক মাথার উপর, আমিও পৌছলেম মিতার বাড়ীর আঙিনায়। অকারণেই 'মিতা' সম্বোধনটা হলো একটু উঁচু স্বরে। কিন্তু বাড়ীটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে কোন্ মায়াবীর মোহিনী মন্ত্রে। মানুষ আছে দু'চার জন কিন্তু সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি ; পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ওর মা, আলুথালু বেশ, স্বরটা ভারী। স্বর ফুটল, কথা ফুটল না মুখে ; উদ্দাম কান্নায় অতি কষ্টে বোঝা গেল, "বাবা মা বামুই, চেদ্‌া এম হেই্‌ আকানা।" এর সোজা বাংলা—বাবা তো নেই, তুই কেন এসেছিস। শুনলেম ঈশ্বরই তাকে নিয়েছেন।

* * * *

বিকেলে সেই ডিম্‌ডিমার ধারে এসে বসেছি, ঠিক সেই শিলায় যেটিতে বসেছিলেম মিতার সাথে। মাত্র চারমাস আগের কথা, সেই চিরপরিচিত জলস্রোত তেমনি চলছে এঁকেবেঁকে, শুধু মিষ্টতা হারিয়েছে ওর কলতানে।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছি পশ্চিম দিগন্তে, রক্তিম সূর্য ম্লান মুখে চলে যাচ্ছে দৃষ্টির ওপারে। পশ্চিম আকাশ যেন করুণ চোখে চেয়ে দেখছে আমায়। অন্যমনা হয়েই চেয়ে দেখছি চুন্‌কীদের বাড়ী, মনে হলো যেন আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে আমারি মতো উদাস চোখে একটি কালো মেয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে এই নদীর দিকে।

দর্শনের কয়েকটি পাতা

গুরুপ্রসাদ দাস

জানিনা কবে সুদূর অতীতে পৃথিবীর বুকে অসহায় মানুষ তাকালো আঁখি মেলে, অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারের অন্তস্থলে জানবার কি স্পৃহা সুপ্ত ছিল সেদিন। ধীরে ধীরে অসহায় মানুষের মাঝে যেদিন বিকাশ লাভ করল জ্ঞানের স্বল্পতম কিরণ স্ফুলিঙ্গ। পরম সত্তার আপন বিকাশের উপলব্ধিতে অসহায় মানুষ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'লো জগৎ বৈচিত্র্য লীলায়। প্রশ্ন করল—নিজের কাছে আমি কে? আমি কোথা হ'তে এসেছি? আমি কোথায় যাব? এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চেয়েছে মানুষ। উত্তর কি পেয়েছে? বুদ্ধিশীল মানব, চিন্তাশীল মানব গভীরভাবে চিন্তা করেছে আত্মিক সমস্যা সমধান করবার জন্য। উত্তর পেয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষ সম্প্রদায়—গভীর ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাধনা, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা এবং বীর্য গরিমায় চরম উপলব্ধি দিয়ে আর্য জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে শুধু ভারতের কাছে নয়, সুদূর পাশ্চাত্য জাতির কাছে বিচ্ছুরিত করেছে আপন জ্ঞান গরিমার উজ্জ্বল আলোক রাশিতে। আর্য জাতির আপন উপলব্ধি চিরসঞ্জীবিত করে রেখেছে ভারতীয় প্রতি নরনারীর চিন্তাধারায় বেদান্তের অদ্ভুত স্ফুরণে। সেই এক পরম সত্তা পরম আনন্দ, পরম অস্তিত্ব, পরম চৈতন্য সকল কিছুর মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করে প্রকাশের চরম পর্যায়ে উপলব্ধি করছেন নিজেকে। বহুর মাঝে তিনি এক সীমার মাঝে তিনি অসীম, অজ্ঞানের মাঝে তিনি পরম জ্ঞান। চরম দুঃখে তিনি পরম আনন্দ, তিনি মুক্ত, তিনি সত্য, তিনি শিব, তিনি নীতির চরম আদর্শ। তিনি প্রাণের প্রাণধারা, তিনি চিন্তায় চিন্তাহারা, তিনি বন্ধনের মুক্তি, তিনি বুদ্ধি, তিনি ভক্তি, তিনি স্মৃতি, তিনি নর, তিনি নারী। অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় তাঁর উপলব্ধি। একমাত্র সেই পরম পুরুষকে স্মরণ করে অসহায় মানুষ চরম শক্তি শিখরে চরম পর্যায়ে পরম পতাকা উড্ডীয়ন করে পরম আনন্দ লাভ করতে পারে। মুক্তিই ছিল আর্য সম্প্রদায়ের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাই তাঁরা একদিন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"Liberation is only the ultimate end in human life". (মোক্ষই চরম মুক্তি)।

ভারতের বুকে এলেন জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে এক মহান তপস্বী। আপন সাধনায় এবং বীর্যগরিমায় উপনিষদের সার তত্ত্বটুকু প্রচার করলেন বেদান্ত চিন্তাধারায়। কি বিপুল জ্ঞানের গভীরতা, কি সূক্ষ্ম বিচার। কি অপূর্ব সত্য নিষ্ঠার চরম নিদর্শন প্রকাশ করলেন অধ্যাস ভাষ্যে। "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।" দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় যে অধ্যাসের অভিজ্ঞতা লাভ করি তা যদিও সামান্য, তার

দ্বারাই তিনি ব্যাখ্যা করলেন হৃদয় সত্যের জ্ঞান মর্মদ্বার উদ্‌ঘাটন করে পরম সত্যের মহা সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব। যখন আমরা একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম করি সেই ভ্রমের বিষয়বস্তু কি সত্য না মিথ্যা? শ্রদ্ধেয় শংকরাচার্য বললেন—যদি সেই ভ্রমের বিষয়বস্তু সত্য হ'তো তাহলে সর্প জ্ঞানের কোন sublation (বাধ) থাকত না। আবার ইহাকে মিথ্যাও বলা চলে না। কারণ ইহা absolute মিথ্যা হ'লে ইহার প্রতীতি হ'তো না। তাহলে অধ্যাস কি?—অনির্বচনীয় (indeterminable)। এই অধ্যাস অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি দেখালেন সমস্ত জগৎ রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। না মিথ্যা না সত্য। জগৎ প্রপঞ্চের মাঝে রজ্জুর ন্যায় ব্রহ্ম লুকায়িত হয়ে অজ্ঞানীদের কাছে তিনি আপাততঃ জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতীতি হন। যেদিন পরম সত্তার জ্ঞান কৃপার পরশে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যায় সেদিন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় জ্ঞানী উপলব্ধি করে জগৎ অবভাস মাত্র, একমাত্র সত্যই ব্রহ্ম। তিনি নিগুর্ণ, তিনি পরম চৈতন্য, বহু মিথ্যা, সংসার মিথ্যা। শংকরের দৃষ্টি হ'লো Practical standpoint থেকে জগৎ অলীক এবং ক্ষণিক। কিন্তু Transcendental viewpoint থেকে জগৎ সত্য।

তারপর এলেন রামানুজ। বেদান্ত চিন্তাধারায় প্রবর্তন করলেন তিনি নবযুগ। শংকর এবং রামানুজের লক্ষ্য এক। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ধরা পড়ে রামানুজের এই উক্তিতে। সংসার সত্য, জগৎ সত্য, একও সত্য, বহুও সত্য। একই পরম সত্বা বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করে সকলের অন্তর্যামীরূপে। একের মধ্যেই বহু। বহুর মধ্যে এক। ধীরে ধীরে বেদান্ত চিন্তাধারা সহজ সরলরূপে বিকাশলাভ করল সহজ সরল সত্যান্বেষী সাধক শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ে। তিনি জগতের সবকিছুকে পরম সচ্চিদানন্দের অপূর্ব বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন। পরম আনন্দময়, পরম অস্তিত্বময়, পরম চৈতন্যময় (existence, consciousness, bliss) আপন উপলব্ধির মহিমায় নিজেকে নিক্ষেপ করলেন অজ্ঞানের অন্ধকারে (in-conscience)। কি অপূর্ব যিনি পরম জ্ঞানী তিনি নেমে এলেন অজ্ঞানের অন্ধকারে। ধীরে ধীরে অজ্ঞানের অন্ধকার হতে তিনি রূপ ধারণ করলেন matter রূপে। জড়প্রাকৃতির মধ্যে রইলেন তিনি সুপ্ত পুনঃপ্রকাশের মর্মবেদনায়। Matter বিকাশলাভ করল vital lifeএ। vital life-এর মধ্যে তখনও নৈতিক চেতনার বিকাশলাভ সম্পূর্ণভাবে হয় নি। তবে ছোঁয়া পেয়েছে। Vital life আবার একধাপ অগ্রসর হয়ে এল mindএ। অভিব্যক্তির স্তর আজ mind পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। নৈতিক চেতনায় পাপ, পুণ্য, ভাল মন্দের ধারণা এই স্তরে পৌঁছেছে। অভিব্যক্তি কি এখানেই শেষ? না পরম সত্তার বিবর্তন ধারার পথে mind বিকশিত হবে higher mindএ। Higher

mind over mindএ। Over mind illumine mindএ। Illumine mind super mindএ। এই supermindএর স্তরে পরম সত্তা আপন স্বমহিমায় বিকাশলাভ করবে। পরম অজ্ঞান জ্ঞানে, পরম দুঃখ পরম আনন্দে পরিণতি লাভ করবে মানুষের মাঝে পরম সত্তার চরম প্রকাশে। সেইদিন নশ্বর ধরাতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে নবজীবন। সেই জীবন হবে দিব্যজীবন (Divine life)। অরবিন্দের কথায়—বিবর্তনের এই যে প্রতি স্তর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তরে—দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তরে Integrate হবে! "It is new principle which we find in Aurobindo's Philosophy that is called a principle of integration."

অরবিন্দের মতে পরম সত্তার কাছে নিজের চরম আত্মোৎসর্গ মুক্তির প্রধান উপায়। ধীরে ধীরে সেই বিশ্বাতীতের সাথে নিজ সত্তার অপূর্ব মিলনই চরমযোগ। "Only the one who offers his whole nature, binds the self. Only the one who can give everything, enjoys the Divine All everywhere. Only a supreme self-abandonment attains to the Supreme. Only the sublimation by sacrifice of all that we are, can enable us to embody the Highest and live here in the immanent consciousness of the transcendent Spirit".—Aurobindo.

তারাটি

সমীর দে

কতদিন কেটে গেলো অবিরল বৃষ্টি শুধু
আমি উদাসীন আকাশের দিকে চেয়ে।
দিন কেটে সাঁঝ হয়ে আসে।
আমি বসি জানলার পাশে।
আকাশের ঘন রঙ কেটে,
একবিন্দু আলো যেন ফোটে
সহসা ব্যাকুল হয়ে উঠি।
প্রদীপের ছোট শিখা নিভিয়ে
ঘর দিই অন্ধকার করে।
আরো স্পষ্ট সেই বিন্দু।
চিনলাম প্রিয় তারাটিকে।
হায়! সে ক্ষণিকের দেখা।
দমকা বাতাসে জানলা যায় বুজে।
হতাশার মন নিয়ে শুধু,
তৃপ্ত হই কল্পনায় খুঁজি।

'সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।'

—রবীন্দ্রনাথ

সীমান্ত

সুকুমার দাস

হাল্‌কা নীলের চাঁদোয়া মাথায় পাহাড়,
কটি-তটে তার শ্যামল দুকূল বন ;
শুভ্র-নূপুর চরণ বেড়িয়া ঝঙ্কারে ঝর্ণার,
হরিৎ-আলোর হলুদ-মাখানো মন ।

কাঁচুলি দুলানো বাতাসের শিসে উন্মনা,
পথ-চাওয়া সুর টেলিগ্রাফের তারে ;
ঋতুর পরশে চম্‌কি ওঠে এ নির্জনা
সোনালী স্বপনে জড়ায় সে আপনারে ।

দামামা বাজায়ে দুর্দম আসে কারা ও,
মাটি কুরে কুরে বরের যাত্রী বুঝি ?
পুষ্পক হতে ফুলঝুরি ফেলে, উধাও ;
অতি প্রেম ফেরে অত্যাচার কি খুঁজি ?

শিখরীর শিরে সিদুঁরে মেঘেরা নামে,
শ্যামল দুকূল বিবর্ণ গৈরিক্ ।
দেঁতো-হাসি দিয়ে হীন অভিনয় থামে,
প্রশান্তি নামে নির্ব্বাক্ শ্মাশানিক ।

৩রা ডিসেম্বরের প্রার্থনা

নজরুল হক

হে শিল্পী, তুমি বিস্মিত
আমাকে দেখে।
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যাকে দেখেছিলে
যখন প্রথম তোমার চরণ স্পর্শ করল রাঙা মাটিতে,
তখন তুমি যাকে দেখেছিলে ষোড়শী,
শিল্পী, আজ আমি সেই বালিকা।
তোমার দৃষ্টিতে হয়তো আজ শ্রীহীনা ;
হাসি পায়, দুঃখ হয় !
আমার ইতিহাস বড় করুণ।
তবু আমি গর্বিত,
আমি যে গ্রামের মেয়ে,
আমি যে কোপাই নদীর মেয়ে,
কাশফুল আর কেয়াফুল,
খোয়াইয়ের পাথর-নুড়ি নিয়ে
আর তোমার রঙ্ নিয়ে
আমি স্বপ্ন দেখেছি।
হে প্রেমিক, তুমি আজ আমায়
অস্বীকার করতে পার,
কিন্তু আমি তো জানি,
তুমি আমায় ভালবাসতে।
আমার রূপ-সাগরে তুমি ডুব দিয়েছ
আহরণ করেছ মণিমুক্তা।
তোমার মনে পড়ে—
আমার হাসি কাঁপতো যখন ঘাসের আগায়,
প্রভাতে শিশির বিন্দুর মধ্যে নৃত্য করত,
সে-নৃত্য তোমার চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।
মনে কি পড়ে—
দুপুর বেলায় লালধূলা উড়িয়ে
আমলকি শাল, মহুয়া বনে দুষ্টুমি করতাম
রাখাল দলে মিশে ;

সবুজ আঁচল উড়িয়ে তোমার আঙিনার প্রান্তে—
শরতে ধানের আগায় দোল খেতাম।
গভীর রাত্রে বোলপুরের পথে গরুর গাড়ীর শব্দ উঠত।
সন্ধ্যায় শ্রান্ত পদে যখন সাঁওতালের দল
ফিরত বাড়ী,
তুমি অবাক হয়ে কান পেতেছ!
অস্বীকার করতে পার—
আমি তোমার স্বপ্নের নূতন ছন্দ জাগাইনি?
বেদ পুরাণ, মহাকাব্যে যা পেয়েছ
আমার মধ্যে তারই বাস্তবরূপ দেখেছ।
আমি তোমার লীলাসঙ্গিনী,
আমি তোমার শিব।
হায় সাধক—
আজ রাঙাধূলিহীন পথ
কার কালচে রক্তের স্বাক্ষর!
আমার শিরায় শিরায় দগ্ধ ইটের অসহ্য কুঞ্চন।
আমার চারিদিকে পাষাণের নৃশংস অব্যয় রাত্রি।
আমার চারিপাশে জীবনের হলুদ ঝরা পাতা।...
তবু আমি চীৎকার করে বলব—
আমার সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে—
স্বপ্নের জোয়ার ডাকে।
তবু আমার সব বেদনা ভাসিয়ে—
সুরের মূর্ছনা ছোটে
ঝড়ের হাওয়ায় দুলতে থাকে আমার স্বপ্ন—
পদ্মের মত।
আমি যে তোমার রক্তের ঠিকানা চিনেছি,
আমি যে তোমার গানের স্বরলিপি জেনেছি
তোমার হৃদি বীণায় সুর বেঁধেছি
তোমার রূপের আলোয় পথ দেখেছি;
চেয়ে দেখ আমি আছি,
আমার সব আছে।

অতীতের মত আমার রূপ তোমার চোখে
স্বপ্নের জাল কি বুনছে ?
তবু একটি প্রার্থনা—
অনেক ঝড়ের ভিতর দিয়ে—যারা হেঁটে আসছে
তাদের জন্য দ্বার খুলে রেখো,
অনেক বাধার নদী পেরিয়ে যারা
কূলে এসে ভিড়ছে
তাদের জন্য হৃদয় মেলে ধরো ।
মেঘাচ্ছন্ন ধ্রুবতারাহীন রাত্রিতে যারা পথভ্রান্ত
তাদের জন্য প্রদীপ জেলে রেখো ।
পঞ্চাশ বছর আগের সেই আদিমস্বভাবা তরুণী
আজ সভ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে ।
আজও আমার শিরায় শিরায়
আদিম রক্ত নেচে বেড়ায় ।
আমি বিশ্বাস করি
আজও তোমার চোখে সেই-আমি
সেই-আমি রাঙাধূলি মাখা বিবস্ত্র তরুণী ।
*৩রা ডিসেম্বরের প্রভাতে
হে শিল্পী, হে প্রেমিক, হে সাধক
তোমায় শত কোটী প্রণাম ।

* শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্মদিন
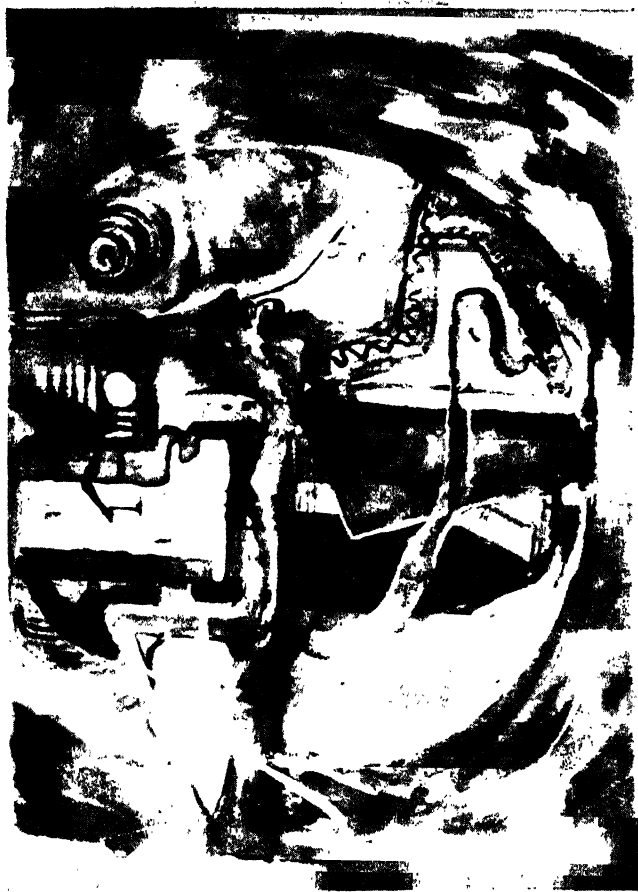
Juxtaposition

Neel Pawan Baruah

“Katum Kutum”
Bramharashi Sakoo

রবীন্দ্ররচনায় লৌকিক ছন্দ

শ্রীমন্তকুমার জানা

সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তা নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। ঐ ভাষণের এক অংশে কবি বলেন।—

> "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দানতো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।
>
> তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।
>
> আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ করে না থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার কেন্দ্রমূলে যে গভীর স্বদেশ প্রীতি বর্তমান ছিল তা উদ্ধৃত অংশটিতে সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। কবির নিকট স্বদেশ এক জীবন্ত বিগ্রহ—সে এক চিন্ময়ী সত্তা। মানুষ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়েই স্বদেশ। অতীতের ধ্যান ধারণা ও চিন্তাভাবনার আদর্শ গ্রহণ এবং বর্তমানের কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে দেশ ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত ও বিকাশমুখী হয়ে উঠবে—এই ছিল কবির স্বদেশ-চিন্তার মূল লক্ষ্য। আর এ জন্য মানুষ:কে থাকতে হবে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতামুক্ত, জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সাধনায় দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি নেতিমূলক—

১ 'আত্মপরিচয়' (১৩৫২ সং), পৃ ৯৪-৯৫

জীবনচর্চায় মানুষের ভ্রান্তসংস্কারাচ্ছন্নতা ও মূঢ়তার সমালোচনা। অন্যটি ইতিমূলক—আত্মপ্রত্যয়গত বলিষ্ঠ জীবনচেতনার বাণী ঘোষণা, অতীতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রচার এবং জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে তার নবরূপায়ণ ও বৈচিত্র্যসাধন। প্রাচীন যুগের ইতিহাস, কাব্য, দর্শন এবং মধ্যযুগের সাহিত্য ও সাধুসন্তদিগের জীবনচরিত ও ধর্মসাধনার নানা কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বীকরণে সমঞ্জসীভূত ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। শুধু এই নয়, মাটির-কাছাকাছি-থাকা সাধারণ লোকজীবন তাঁর সাহিত্যসাধনার কেন্দ্রমূলে বিরাজমান ছিল। এ স্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে লোকসাহিত্যের ভাববৈশিষ্ট্য ও শিল্পরীতি থেকে ভদ্রসাহিত্য সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত হলে তার প্রাণশক্তি অর্থাৎ রসসৌন্দর্য হীনপ্রভ হয়ে যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুবিধ দানে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। রামায়ণ ও মহাভারত প্রথমে লোকসাহিত্যরূপে লোকমুখে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল, পরে এ দুটি ভদ্রসাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। Homer-এর Illiad, কালিদাসের শকুন্তলা, Shakespeare-এর Hamlet, Goethe-এর Faust এবং Boris Pasternak এর Doctor Zivago প্রভৃতি গ্রন্থগুলি লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে সমৃদ্ধ।

বিপুল ও বিচিত্রপথগামী রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলার লোকসাহিত্য থেকে রস সঞ্চয় করেছে—বোধকরি একথা অত্যুক্তি ঠেকবে না। ১৯৪০ সালে ছেলেবেলায় কবি লিখেন।—

"যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর জাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরী।"[১]

রবীন্দ্রসাহিত্যে এই উক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে। বাংলার সরসমৃত্তিকা থেকে যে সুর উত্থিত হচ্ছে তাকেও তিনি তাঁর ঐকতান সুর সাধনায় গভীরভাবে একাঙ্গ করে নিয়েছিলেন। পল্লীবাংলার জনসাধারণের জীবনযাত্রার কেন্দ্র থেকে প্রাণলীলার যে বিচিত্র স্ফুরণ ঘটছে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে— সে সম্পদও তিনি গ্রহণ করেছেন গভীর ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধা সহকারে। জনসাধারণের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ও তার পরিমণ্ডল, লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ছন্দ এবং লোকনৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস রবীন্দ্ররচনায় উজ্জ্বলতর মহিমা লাভ করেছে। অন্য কোনো বাঙালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর সাহিত্য সাধনায় বাংলার লোকসাহিত্যকে এত ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে গ্রহণ করেননি। লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের

১ 'ছেলেবেলা' (১৩৫৩ সং), পৃ ৬০

বিষয়বস্তুকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি লোকসাহিত্যের ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কেও বহু আলোচনা করেছেন। লোকসাহিত্যের অর্থাৎ চলতি ভাষার ছন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ ও সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা নানা উপলক্ষেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত নানা প্রবন্ধে। শুধু তাই নয়, তাঁর এই চিন্তা ও অনুরাগ বিচিত্ররূপ ধরে লীলায়িত হয়ে উঠেছে তাঁর আপন সৃষ্টিতেও। বলা বাহুল্য, গ্রাম্যজীবনের অন্তঃপুরে যে ছন্দ সীমিত তাকে তিনি রূপৈশ্বর্যে ও ভাব-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে ভদ্রসাহিত্য সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বাংলা লোকছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং সে ছন্দের উপাদানে রচিত তাঁর সৃষ্টিলীলার বিবর্তন ও বৈচিত্র্য এদিক্ থেকে সত্যই বিস্ময়কর ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১]

'জন্মদিন' (১৯৪১) কাব্যের এগারো নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে, তিনি তাঁতি, জেলে ও কৃষক প্রভৃতি দীনমূক জনসাধারণের কবি হতে পারেন নি। কিন্তু জনসাধারণের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত লোকসাহিত্যের ছন্দকে, তার মূলনীতির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, নানা ভাবে রূপায়িত করে কাব্যকলা ও ভাব-সৌন্দর্যের যে লক্ষণীয় আভিজাত্য ও মর্যাদা এনে দিয়েছেন তার তুলনা নেই। কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে রসধারার প্রবাহ সংস্কৃত-না-জানা বঙ্গবাসীর নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি লৌকিকছন্দ যে সর্বপ্রকার ভাবধারা প্রকাশের উপযোগী তা অজস্র সৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কবি সমাজের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৩২৪ সালে লৌকিক ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> "সাধুভাষায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তার পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে ; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সংকোচে তার আত্ম পরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে।"[২]

লৌকিক ছন্দের পংক্তি কোথায় তা ১৩২৪ সালের পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচিত বহু কবিতায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ছন্দ যে-কোনো বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে সক্ষম। রবীন্দ্র সমকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১ 'রবীন্দ্ররচনায় লৌকিক ছন্দ : প্রথম পর্যায়' রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। লেখাটি 'সমকালীন' মাসিক পত্রের ফাল্গুন সংখ্যায় (১৩৭২) প্রকাশিত।

২ 'ছন্দ' (১৯৬২ সং), ছন্দের অর্থ, পৃ ৫১

প্রমুখ কবিরা এছন্দে কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রোত্তর কালের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ মাঝে মাঝে এই ছন্দকে প্রয়োগ করেছেন। সাম্প্রতিক কালের কবিদের ক্ষেত্রবিশেষে এ ছন্দকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোনো কবিই সচেতনভাবে এ ছন্দটিকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করার জন্য সচেষ্ট হন নি। আধুনিক যুগের সংশয় কণ্টকিত জিজ্ঞাসাবাদকে লৌকিক ছন্দ যে নির্বিবাদে প্রকাশ করতে পারে— সাম্প্রতিক কবি সমাজের নিকট এ আশা করা বোধ করি অন্যায় হবে না।

'চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনো দিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।'

—রবীন্দ্রনাথ

ক্লান্ত একটি রাত

মহুয়া কর চৌধুরী

নিস্তব্ধ রাত
দূরের ঘড়িতে সঙ্কেত আসে—বারোটা।
মাঝে মাঝে ভেসে আসে কুকুরের ডাক,
আর আর্ত্ত চীৎকার—
প্রহরীদের বিক্ষিপ্ত পদচারণা আর সাবধান বাণী।
রাতের বুকে হেলে পড়া বৃক্ষের দু' একটি পাতা।
টুপ্‌টাপ্ শব্দ করে ওঠে।

পাশের খাটে নিশ্চিন্ত নিদ্রা
মাঝে মাঝে শুনি নিশ্বাসের শব্দ।
উদগ্র বাসনা আর রাত্রির চঞ্চলতা
কোন কিছুতে সঙ্গতি খুঁজে পাই না।

আশে পাশে আর বুঝি কেউ জেগে নেই
শুধু আমি আর আমার বিক্ষিপ্ত মন—
নিজের বুকের শব্দ শুনতে পাই।
তার সঙ্গে অতন্দ্র প্রহরীদের হুইসেল—
আকাশ পাতাল তফাৎ।
মিল কোথাও পাই না—

নিশুতি রাতে পেঁচার ডাক
আর ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের চীৎকার
ভয়ঙ্কর মনে হয়।

রাতের অন্ধকারকে যেন আরো গভীর লাগে।
একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক কানে শ্রান্তি আনে
নিষ্ঠুর মনে হয় আজকের রাত্রিকে।
কি যেন খুঁজি কিন্তু পাই না—
অশান্ত মনটা বার বার ধাক্কা খায়,
রাত্রি আরো গভীর হয়।

দূরের সঙ্কেত আসে—একটা বাজে
তারপর আর জানিনা,
চোখ মেলে দেখি অরুণ রাগ রেখা।
বুঝলাম মিল খুঁজে পেয়েছি,
তাই এই শান্তির নিদ্রা।—
গত রাত্রিকে নূতন করে সুন্দর মনে হ'লো।

—

INTROSPECTION

SRIKUMAR DIKSHIT

LET THE lamp snuff out its flickering ...
and let the window be closed,
that no light may intrude into the Chamber
    and no star wink through.
    Let there be no light—
      and let me be
      here in the midst of darkest somnolence.
Insatiety consumes inly
          the haphazard mind with contrition.
    The pulse-beat of the solitary clock
          enables me to feel that of the earth.
    A strong lethargy creeps in
      and I sink into oblivion
          of all that's past.
    For I, no more, fall a victim
                    to reverie,
    and sing no serenade to deceive
          my brimming heart again.
    My secession to seclusion is withstood
          by my own consternation.
    I, to my own self, yield me
          to introspect once again.

*   *

The smouldering lamp blots out.
Excogitation along with the darkness
                    reigns supreme.
    I take a detour
      to achieve my extrication.

CRISIS OF MORALITY IN MODERN MAN

KSHITISH CHANDRA GHORAI

THAT THERE has been a crisis of morality in the life of modern man is universally and unequivocally recognised. Crisis that is tormenting man does not come from without, but comes rather from within. Man's soul has rebelled against its own state : his conscience is in constant war : his very existence is being threatened. We are indeed advancing, but, not Progressing, for, Progress means spiritual perfection and sublimation of soul. Our modern life being divorced from its ethical code may very well be compared to a house-built upon sand, it is a body without soul. It may also be said that our life divorced from morality is like "sounding brass, good only for making a noise and breaking heads."

The crisis that has *paralysed our conscience* has its two fold bearing on us : first, it has weakened to a great extent our moral character, and secondly it has arrested our capacity to reason and think logically. This state of spiritual lethargy has darkened our horizon of thinking or behaving rationally. While we are physically awake, mentally we are in a state which is worse than that of death. In fact, a dreadful catastrophe is looming large on our mental horizon. We are living in the midst of a strange crisis—the crisis of tormented and agonised spirit, our soul is wounded. The malady we are suffering from is a spiritual one. The worst kind of conflict that is the cause of our present crisis comes from man himself. There is an inner conflict him. But he should realise that success depends on his effort to attain mastery over his mind and passion.

Civilization today has come to mean material prosperity, simply an economic and political rise of a nation. The higher the degree of material advancement, the greater the economic and political stability, the greater civilized a nation becomes. The result has been the spiritual and moral bankruptcy. Too much emphasis on materialism has tended to make our present Political cum Economic Civilization a direct cause of the terrible wars. Rapid scientific advancement has made our life happier, brighter and more prosperous no doubt, but from another point of view it

has made our life insecure and shaky as well. Power Politics is increasingly assuming greater importance. The world is divided into two hostile blocs.—The shadow of the Third World War is looming large on the horizon. Modern man is not having Peace, but rather his very life is being threatened by the outbreak of a war, for, he knows well that modern war means total destruction and annihilation of the so-called scientifically regulated civilised society of ours. He is in a state of oppressed and suppressed anguish. The inevitable result is that the sweet and sanctified relationship between man and God has been broken. Our conscience grows sharply pointed like a thorn which pricks our soul constantly. There is no harmony between our thought and action. We are deprived of the purity of heart and holiness of soul to adore God who is to dwell in the temple of our hearts. Like a bird caged for years, man is being kept in the prison house of this civilization. Indeed, we are, today, dwellers of a godless, faithless, creedless, immoral world—where there is nothing but "inward rotting" and tormented repentence.

Now the problem is how to rid the world of its manifold ills. A spiritual approach is the only way to rid the world of its diverse problems—a solution that will reconstruct the shattered tie between man and God. Indeed, there has been some sort of enmity between man and man, which, is again an enmity between man and God. There is one way of banishing enmity from the world : purification of soul, attainment of perfection with charity and humility. The moment they reign supreme a new order will emerge. Modern life must be liberated from spiritual eclipse by dint of our spiritual will-power. War must be declared a moral crime, violence is to be abhored, civilisation based upon the principles of love, justice, peace, fraternity, mutual affinity and goodwill and negotiation is to be evolved.

BOREDOM

HIMADRI RAY

As Byron saw it :

Society is now one polished horde,

Formed of two mighty tribes, the Bores and the Bored.
Alas, the polish has been wearing pretty thin. The noble lord's malaise is decidedly pre-Atom Bomb. Yes, boredom, the inseparable companion of *Homo insapiens* in general and today's youth in particular. It is difficult to locate this disease, whether it is categorically a modern or not. The coinage owes its origin to the aesthetes and the existentialists, so much is obvious. Lord Russell makes a subtle distinction. According to him our ancestors had greater borendom, but we have greater fear of boredom. What, by the way, is the opposite of boredom ? The antonym of boredom is, I think, excitement and neither happiness nor pleasure. The Yogis or the Roman Catholics might say that we should aspire after the peace of mind, to counteract this sick hurry of our days. But is this not rather a hazy notion ? A callous phase.

We admit, all of us, that we are bored. Youth's rosy cheeks are, to day, a myth. Hollow young men have hollow cheeks. (What else did you expect ?) We are bored at home, in the class rooms and the libraries, the restaurants and the cinemas, even on tennis courts. We are tired of doing nothing, even of the compulsion to act in a novel way and, as the all-knowing psychiatriatrists know, in terms of morbid cravings. The result is dullness of brain, then callousness, followed by frustration—in acute cases schizophrenia, that plague of our divided times.

But should we entirely blame the young for all this ? Is not old men's science and cult of success responsible for what is happening ? Soft landing on the moon is, so far, our hardest earned achievement, but at the same time there is the constant threat of racial suicide. The agonising question of our era remains : Can we hope to survive a nuclear war ? Here comes that overpowering fear of Death and fear of Nothingness. True, science is progressing, yielding greater outwardization, and excitement begets excitement. But then boredom begets more boredom.

Why this blight and where do we go from here ? Our parents

frown upon juvenile delinquency and love to say that boys were different in their time. But I bet that today there is much more adult delinquency than we can think of but just don't mention. In their eye what pervades society and gets the maximum Kudos is the celebrated word 'Sex'. Wherever you go, It is there, an obsession both to the young and alas, the old. And what could give you greater boredom than a compulsion neurosis ?

Read the newspaper ? Look at the lush advertisements. What on earth has a steel concern or an after-shave lotion company to do with a female figure ? But the admen put them there and they know better. Most news is a variation of law court reports. As for modern literature, if you haven't read Navokov, Miller, Becket or Moravia, oh, you are out-dated. Ginsburg you couldn't enjoy ?—try to develop a taste, boy.

After all we have to find out what precisely we want. Most of us, it would seem, want to be 'pigs satisfied'. It is so easy to be one even without a Circe around. What about Sophia Loren or Mademoiselle Bardot ? Or the local apsarās ? Few of us care to imitate Socrates dissatisfied and resignedly sipping the hemlock. The fellow was a prig. He had little sense of fun except to argue and argue. No wonder the Establishment got tired. It is hard to say what exactly we want or what will make us happy. It is an old rule that the more we get the more we want. But there should be a limit somewhere. When we can'nt reach it—we feel crazy, when we feel that we more or less reached the limit, it becomes miserable. Because even the fast cars and fast women give you a headache. Descendants of Sisyphus, we strain our muscle to pull the stone upward on the top of the mountain. When it is reached—it drops down below — and we feel all is empty again.

The familiar diagnosis is there, but what about the prescription ? It is difficult to prescribe for a disease which we inherit. One can only try. The first and perhaps the only cure, I would suggest is work for work's sake. As Goethe put it—it's sincerity that counts without which cleverness is nothing. 'A young man who has some serious and genuine, constructive purpose will endure voluntarily a great deal of boredom if he finds that it is

necessary'. Most of us are what we ought not be, doing what we ought not to do. Back to the ancient insight : Know Thyself ?

Causes of unhappiness have been discussed and diagnosed by alienists of all ages. There is fear of competition, sense of sin, persecution mania, fear of public opinion, scorching envy, killing fatigue and above all fear of Death. Each one of them leads to boredom and makes us unhappy. It is easy to say that the happy life is a quiet life and it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live. But the world—our world—this bitter, dirty, beautiful place— this restless world—all talking but none listening— would not let us become quiet. Count no man hapyy till he is dead !

So the desparate remedy is : bore yourself deliberately— bore yourself to death. The fifth cigarette is always awful. Yield to fastness. Suddenly you'll see that it is all pointless—and you'll become quiet again and find that the world is not so bad a place to live in. One fine morning we may wake up and find that the subconscious in us has done the miracle—suddenly we feel that the boredom is gone and, as I said before, the world is not a bad place to live in, at least not so dull and uninteresting. How was the miracle done ? I cannot say. No one can say. But who says that the age of miracle is over ? Boredom is gone and you arrive at the border of Beatitude. The Song of Innocence and the Song of Experience are one.

Kashmır Family

Vijay Gupta

Spring

S. K. Pathak

ON TRANSLATION

Angshuman Bhattacharyya

Language is a series of symbols. If I write the word "Tree", it forms an impression in my mind, because since early childhood I have been conditioned to react in certain ways to various line-patterns called letters. Some of these letters appear in the word "Tree".

If I have not learned the meaning of this letter there is no reaction. Bengali-speaking persons can see the same tree, but know a different linear symbol.

It is then possible to formulate a table of equivalent symbols relative to particular object.

Although an English person and a Bengalee can learn each other's language, their individual experiences differ considerably. For instance, an English poet writing about fire-flies has a vivid picture of one single fire-fly in the grass or on a hedge; but a Bengalee poet writes of a sky full of flashing green stars. Both languages have symbols for the same fly but each has a totally different experience. If I bring a star into it; at latitude around the Tropic of Cancer, the stars move quickly across the sky even during short intervals of observation. While near the arctic regions they appear more stationary.

So both the Bengalee and the English can talk of the stars using their own symbols, but neither can completely understand the other's personal experience.

As well as natural phenomena of the local environment, we must take into consideration differences in social, political and religious indoctrination, differences in racial temparament due to climatic and geographical differences.

The variations of understanding are directly relative to all possible variable factors in the environments and personalities concerned. For example, if I live on the mountains amongst tall pine trees and my foreign friend lives in a valley full of Oak trees, we can both write about trees and understand each other's language but because of our different experiences of trees the understanding of, or association with the one word differ so much.

Even people who speak Bengali fluently cannot understand the original images of Tagore. They translate the same words as having different meanings. If people who speak the same language cannot understand each other, imagine the increased difficulties between those who speak different languages.

There are as many languages in the world as there are people, because every person has an individual experience. Two people brought up in exactly the same environment can still hold different views about it.

Difficulties in translation are not only restricted to written words. When I talk to a person, his ears are equipped to pick up my sound and his eyes are equipped to see expressions of my face. But his understanding of those words and expressions depend considerably upon his experiences. We cannot even understand each other's spoken words. These are accompained by many facial expressions, hand movements and nervous fidgetting etc. It is often difficult to see how much truth there is in a person's spoken words even when accompained by all these personal peculiarities. How difficult, then, it is to understand written words which are free from any dynamic expression.

काव्य और सङ्गीत के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण

इन्दुप्रभा

काव्य और सङ्गीत की अभिन्नता की ओर संकेत करते हुए पोप ने एक स्थल पर कहा है—

> Music resembles poetry ; in each
> Are nameless graces which no methods teach,
> And which a master-hand alone can reach.

अर्थात् सङ्गीत काव्य सदृश है। दोनों नामहीन कमनीयताओं से ओत-प्रोत हैं जिन्हें उत्पन्न करने की शिक्षा कोई भी प्रणाली नहीं देती है, उनका विधान तो चतुर् शिल्पी ही कर सकता है।

अन्यत्र इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए बाबू जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' ने भी लिखा है—

> "काव्य-कला संगीत सरिस जानौ मन माहीं,
> दोऊ में सौन्दर्य किते जे उचरत नाहीं,
> तिन्हें सिखावन जोग सूत्र कोऊ कहुँ नाहीं,
> केवल परम प्रबीननि के आवत उर माहीं।"

कलाओं में काव्य और संगीत सबसे अधिक सात्विक एवं भावात्मक, अतः आनन्द की अभिव्यक्ति के सुन्दर साधन हैं ; कारण दोनों का मूल स्रोत एक ही है। आनन्द या दुःख भावना जब अत्यधिक प्रबल हो उठती है, तो हृदय की सीमा में उसे बाँधा नहीं जा सकता, भाव वाणी द्वारा स्वतः छलक पड़ते हैं, मर्मान्तक अनुभूति शब्दों के माध्यम से बिना किसी प्रयास के व्यक्त होने लगती है। यह स्वानुभूति और अन्तःप्रेरणा वस्तुतः काव्य और संगीत के प्रेरक तत्त्व हैं। चूँकि इन दोनों के प्रेरक तत्त्व, मूल उद्गार-स्थल एक ही हैं, अतः इन दोनों के संबंधों में अभिन्नता का होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। पर यदि हम इन दोनों पर विचार करें, तो पायेंगे कि इनकी पारस्परिक अभिन्नता बहुत बाद में स्थापित हुई। यह तो स्पष्ट है कि काव्य अपनी व्यंजना के लिए वाणी, शब्दों की सहायता लेता है और संगीत अपनी व्यंजना के लिए ध्वनि की लहरों में लयात्मकता की सहायता लेता है। इसलिए संगीत का सम्बन्ध अनायास ही सृष्टि के

प्रारम्भ से स्थापित हो जाता है। प्रारम्भिक अवस्था में, वाणी के अभाव में, हृदय की दुर्दान्त भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति के लिए निश्चय ही संगीत की ध्वनि-तरंगों का सहारा मिला होगा। क्योंकि सांगीतिक स्वरों का अन्तराल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षियों की सुख-दुःखात्मक अभिव्यक्ति में भी विद्यमान रहता है। कोयल के पंचम स्वर में कूकने की जो बात कही गयी है, उसका आधार यही तथ्य है, अतः कोई कारण नहीं कि आदिम युग के मानव की रागात्मक अनुभूति की, सांगीतिक स्वरों के अन्तराल द्वारा अभिव्यक्ति नहीं हुई हो। उस आदिम अवस्था में भावाभिव्यक्ति की समुचित शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। बाद में सभ्यता के विकास के साथ ही वाणी में जैसे जैसे शक्ति आती गयी, भाषा भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी और सहज ही गीतात्मक काव्य की सृष्टि होने लगी। इसी स्थल पर काव्य और संगीत का समन्वय स्थापित हुआ क्रमशः भावनाओं की अभिव्यक्ति सशक्तिता को प्राप्त करती गयी। अभिव्यक्ति की सक्षमता और संगीत का लयात्मकता एवं मार्मिकता ने लोकगीतों के सृजन की परिस्थिति उत्पन्न की और बाद में इन्हें एक ऐसी स्थिति भी प्राप्त हुई जहाँ संगीत और काव्य को स्वतः निरपेक्ष विकास का अवसर प्राप्त हुआ, फलस्वरूप संगीत एवं काव्य की शास्त्र-सम्मत धाराएं बह चलीं। परन्तु आज भी काव्य और संगीत अपनी स्वतंत्र महत्ता स्थापित करने के बावजूद, अपनी मूल समप्रकृति में अविचल, अविच्छिन्न और एकरूप हैं।

आदि कवि वाल्मीकि के वेदनार्त छंद से निःसृत—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत् क्रौञ्च-मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥

केवल काव्य का प्रथम चरण ही नहीं, काव्य और संगीत का अनुपम समन्वय भी है, जिसे अस्वीकारा नहीं जा सकता। हमारे प्रसिद्ध छायावादी कवि पन्त ने भी—

'वियोगी होगा पहला कवि
आह से उपजा होगा गान
उमड़कर आँखों से चुपचाप
बही होगी कविता अनजान।'

में काव्य और संगीत के शाश्वत सम्बन्ध की ओर संकेत किया है। वाणी के अभाव में भी अभिव्यक्ति का संगीतात्मक रूप स्वाभाविक, साथ ही सक्षम भी है। वाणी के

अभाव में, हृदय में अन्तर्व्याप्त व्यथा संगीत का स्पन्दन है, जो वाणी का सहारा पाते ही प्रबल वेग से उमड़कर बहने लगती है। व्यथा का यह प्रस्फुटन काव्य और संगीत के समन्वय का ही प्रतिफलन है।

काव्य और संगीत की पारस्परिक अविच्छिन्नता शाश्वत है, विच्छिन्नता कल्पनातीत। यही कारण है कि भारतीय या पाश्चात्य सभी विद्वानों ने कविता की परिभाषा करते समय संगीतात्मकता का उल्लेख अनिवार्यतः किया है। एडगर एलेन पो का कथन है कि—Music when combined with a pleasurable idea, is poetry, music, without the idea, is simply music, the idea, without music, is prose from its very definiteness, अर्थात् संगीत का जब किसी प्रीतिकर कल्पना से संयोग होता है, तो वह कविता बन जाता है, बिना कल्पना का संगीत मात्र संगीत रह जाता है, संगीतरहित कल्पना अपनी स्पष्टता या निश्चितता के कारण गद्य का रूप धारण कर लेती है।

इसी अभिन्नता की ओर संकेत करते हुए फूलर ने कहा है—Poetry is music in word and music is poetry in sound. अर्थात् कविता शब्दों के रूप में संगीत और संगीत ध्वनि के रूप में कविता है।

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान ने तो काव्य और संगीत की अभिन्नता को स्पष्ट करते हुए यहाँ तक कहा है कि—Poetry is marriage between rhyme and sense.

इन पाश्चात्य विद्वानों के अतिरिक्त भारतीय विद्वानों ने भी काव्य और संगीत की अभिन्नता को स्वीकार किया है। मनुष्य की रागात्मिकावृत्ति हृदय में अनायास ही संगीत की स्वर-लहरियाँ उत्पन्न कर देती है। इसीलिए कविता के शब्दों में समाहित कवि की आत्माभिव्यंजक भावनाएँ स्वर-साधना के प्रश्रय से प्रस्फुटित होती हैं। इसमें शब्दों की अपेक्षा स्वरों का ही अधिक मूल्य है, जिसका आरोह-अवरोह उसकी मूलगत भावनाओं का बिम्ब प्रस्तुत कर देता है, जिससे वह अधिक ग्राह्य और मनोरम हो जाता है। कविता चाहे जैसी भी हो, संगीतात्मकता का आग्रह उसमें सदैव बना रहता है। मैथिलीशरण गुप्तजी ने इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है—

> "केवल भावमयी कला, ध्वनिमय है संगीत,
> भाव और ध्वनिमय उभय, जय कवित्व जय नीति।"

एक स्थल पर पंडित रामदहिन मिश्र ने कहा है—'काव्य की कल्पना, संगीत का राग, अभिन्न है। जिस काम को भाव-जगत् में कल्पना करती है, उसी काम को शब्द-जगत् में राग करता है।'

कविता और संगीत का समन्वय ही काव्य का श्रेष्ठतम रूप है। इसलिए प्रायः सभी विद्वानों ने इसकी अभिन्नता को स्वीकारा है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर वह कौन-सा तत्त्व है जो इन्हें यह प्रतिष्ठा प्रदान कराता है। इसी तत्त्व की ओर संकेत करते हुए ललिता प्रसाद सुकुल ने लिखा है— '...सरस शब्दावली और भावनाओं के सजीव चित्रण जब ताल और स्वर में बँधकर या किसी अन्य ऐसे ही विधान में सजकर व्यक्त होते हैं जिनके द्वारा आन्तरिक समन्वय की प्रतिस्थापना हो जाती है और रस का प्रवाह उमड़ने लगता है तो उसे ही काव्य या संगीत कहते हैं।'

महादेवी वर्मा ने भी अन्यत्र इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहा है—'सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था का गिने-चुने शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है...।' ललिताप्रसाद सुकुल तथा महादेवी वर्मा ने ताल और स्वर, तथा स्वर-साधना द्वारा काव्य में संगीत की अनिवार्यता की ओर ही संकेत किया है।

केवल साहित्यकार एवं कवियों ने ही काव्य-संगीत की अविच्छिन्नता को नहीं स्वीकारा है, बल्कि बड़े-बड़े संगीतज्ञों ने भी इन दोनों के पारस्परिक संबंध और इसके औचित्य पर विचार विमर्श किया है। गायनाचार्य पंडित विष्णुदिगम्बरजी का मत है—'संगीत और काव्य का जब मेल होता है, तब सोने में सुगन्ध आ जाती है। सरस्वती की वीणा-पुस्तक का मेल इसी का निदर्शन है।' श्रीओंकारनाथ ठाकुर आदि ने भी इनके पारस्परिक संबंध को स्वीकारा है।

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि काव्य में किसी-न-किसी रूप में सांगीतिक-तत्त्व अवश्य विद्यमान रहता है। यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों कलाओं की अभिन्नता का कारण इनकी सहज गतिशीलता है। ध्वनि और लय दोनों का उपयोग कविता और संगीत में समान रूप से होता है। अन्तर इतना ही है कि संगीत जिन भावनाओं की सूक्ष्म और निराकार अभिव्यक्ति करता है, उन्हीं को कविता साकार रूप प्रदान कर देती है। इसी स्थल पर यह स्पष्टतया बोध होता है कि—काव्य में संगीत का आग्रह सदैव बना रहता है, जबकि संगीत काव्य को छोड़कर भी आत्माभिव्यंजन में सफल रहता है। काव्य व्यापक हृदयाकर्षक कला है। पर उसका प्रभाव मनुष्य तक ही है, वह

भी शिक्षित, प्रबुद्ध मनुष्य तक ही। इस परिधि से परे काव्यास्वाद कठिन-सा प्रतीत होता है। पर वही काव्य जब संगीतमय ध्वनि और स्वर की तरंगों का संस्पर्श प्राप्त करता है, तब प्रत्येक जीव को हर्षोन्मत और भावाभिभूत बना देता है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में संगीत का आग्रह प्रबल रूप से बना रहता है। काव्य में संगीतात्मकता का आग्रह तो रहता ही है, संगीत-तत्त्वों से समन्वित होकर तो उसकी अन्तरात्मा और भी निखर उठती है। इसीलिए जयदेव, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि ने अपने पदों के साथ उनकी भावानुकूल रागयोजना भी की है।

संगीत की सभी प्रणालियों एवं रूपों का विकास प्रत्येक जाति की स्वाभाविक मनोवृत्ति के अनुसार हुआ है और विभिन्न स्वर-संगतियाँ भी हर्ष, शोक, उत्साह आदि की अनुभूतियाँ का परिचय देती हैं। भारतीय गीत में जिन राग-रागिनियों की योजना हुई है, वे इन विभिन्न मनोरागों के आधार पर ही हुई हैं।

विभिन्न ऋतुओं के जो वर्णन हमें कविता में प्राप्त होते हैं, वे सजीव और प्रभावोत्पादक होते हैं, संवेदनशील भी। पर संगीत की राग-रागिनियों का संस्पर्श पाकर उनमें गतिमयता और तीव्रता आ जाती है। वसन्तराग मधु-ऋतु में जीवनोल्लास के प्रति होनेवाली मानवीय प्रतिक्रिया है, मेघ-राग में वर्षा-ऋतु के आगमन पर आनन्द मनाने की उत्कट अभिलाषा प्रकट होती है, पूर्वी में अस्त-व्यस्त होते हुए दिन के प्रति प्रकृति की वियोग-भावना है, आसावरी में दुःख निवेदन और उद्धार के लिए पुकार है, भैरवी में प्रेम और भक्ति संबंधी निवेदन और नव जागरण का संदेश है। संगीत के ये सभी राग विशेष विभिन्न मनःस्थितियों के परिचायक हैं जो कविता की भावनाओं को तीव्र संवेदना प्रदान करते हैं। अतः स्पष्ट है कि कविता और संगीत का संबंध आन्तरिक बाह्य दोनों ही है। बाह्य सम्बन्धों की उपेक्षा की भी जाय, तो आन्तरिकता सदैव बनी रह जाती है।

अत्याधुनिक काल में संगीत विहीन कविताओं के प्रणयन का आग्रह जोर पकड़ता जा रहा है। अधिकांश आलोचकों की यह धारणा है कि आज की नयी कविता, जो नितान्त छन्द, तालहीन है, संगीतात्मकता से भी पूर्णतः शून्य है। पर वे भूल जाते हैं कि मात्र छन्द ही संगीतात्मकता का वाहक नहीं है। छन्दहीन कविताओं में भी एक प्रवाह, एक गति, भावों का तारतम्य बना रहता है। यह प्रवाह और गति ही संगीत की लय है। यह दूसरी बात है कि इनमें लय की माप का एक निश्चित विधान नहीं

रहता, पर संगीतात्मक प्रवाह तो सदैव बना रहता है। अतः मात्र नई कविताएं ही नहीं प्रपद्यवादी कविताएँ भी संगीतात्मकता से शून्य नहीं है। कविता के पढ़ने में स्वरों या आवाज का उतार चढ़ाव भी संगीत से संबद्ध है। अतः प्रत्येक स्थिति में काव्य और संगीत का संबंध अक्षुण्ण बना रहता है। कविता जब तक गायी नहीं जाती, तब तक अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाती और संगीत भी जबतक गीत से युक्त नहीं होता, तबतक पूर्णतः प्रभावोत्पादक नहीं होता। ताल और स्वर के साँचे में ढलकर जब कविता के शब्द आगे बढ़ने लगते हैं तब प्रत्येक पंक्ति में जहाँ एक-एक स्वर मार्मिक संकेत उपस्थित करता है, वहाँ उसी के साथ प्रयुक्त होनेवाला प्रत्येक शब्द उन संकेतों को मार्मिक स्पष्टता भी प्रदान करने लगता है। काव्य और संगीत एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जहाँ एक की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ दूसरा स्वयं उपस्थित हो जाता है।

Man With a Bird

Parthapratim Deb

The Youth

S. S. Saki

दो रचना छोटी सी

कुसुम कुमारी शर्मा

(१) अच्छा तुक है,
कहाँ की कविता,
औ,
कहाँ की कवियत्री,
यूँ तो मन की
शान्ति के लिए,
झूट को ही
सच बना कर
किसी को बहलाना,
यही है,
कविता की कवियत्री।

(२) झील पर,
तैरती नौका की गोद में,
दो छोटी दिखाई
देती आकृतियाँ,
झील की गहराई में ही
समर्पित सी,
दूर कहीं,
क्षितिज में देखती सी,
विचार मग्न सी,
अचानक यह क्या ?
नौका हिल उठी
आकृतियाँ हिली,
बोली, सिसकी,
फिर उसी में खो गई।

त्रिकोण में त्रिवेणी

सुधीन्द्र कौशिक

वे तीन, इसी लैम्पपोस्ट के नीचे अक्सर······।

लोगों के मुँह से हमने सुना है, जब भी शाम होती है वे इकट्ठे हो जाते—पतिंगों की तरह—पर बहुत दिन तक न चल सकी उन पर यह उपमा, चूंकि बरसात आई और चली गई पर वे पतिंगों के साथ नहीं गये।

वे उसी तरह इकट्ठे होते रहे, मिलते रहे।

और फिर लोग दबे-दबे कानाफूसी में उन्हें लैम्प-पोस्ट का बल्ब कहने लगे। लेकिन वह भी निरर्थक। एक दिन स्ट्रीट-लाइट के तमाम बल्ब जले उस बल्ब के अलावा, फिर भी अंधेरे में उस दिन उनके फारहान्स,, मैकलीन्स, बिनाका के दाँत साफ साफ दिखाई देते थे। बहरहाल ऐसा सोचते हैं अब सभी कि जैसे शाम होती है, वे अपने अपने से निपट, लैम्पपोस्ट के नीचे आते है और वही खड़े हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और मुस्कराते हैं। खैर! वे रोज मिलते हैं, आँधी में, उमस में, पानी में, ठड़ी में आदि आदि। क्योंकि उनकी तीन अधूरी कहानियाँ है उन्हीं की जबानियों में।

* * * *

लैम्प-पोस्ट के नीचे वे महकते हैं, बहकते हैं, ठसकते हैं। बरसात, बिजली का गायब होना उनके लिये "सैटिगं" का "चेंज" होना है।

जब शुरु करते हैं अपनी कहानियाँ तो एक कहता है—"मै नेपोलियन हूँ"।

"चल बे! चुप रह" तीसरा चिल्लाता है उत्तर में।

—"सुनाओ यार! कुछ तो सुनाओ! मन तो बहले"—दूसरा पहले से कहता।

"मैं नेपोलियन हूँ—मैं नेपोलियन हूँ"। नेपोलियन भी कहता था कि मै राजा बनूँगा, पर कौन विश्वास करता था। सिपाही होने के बाद उसने अपनी माँ से भी यही कहा तो शायद उसने भी विश्वास नहीं किया। दो साल बाद वह किंग होकर लौटा था। कितने हैरान हुए थे वे लोग जिन्होंने कभी उसकी बातों में उसका पागलपन खोजा था।

"तो यह है मेरी कहानी"—पहला चुप हो जाता।

तीसरा फिर एक छोटा सा मज़ाक छोड़ता—

"हाँ, तुम नेपोलियन को न जानो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं पर यार ! अपने को तो पहचानो।"

पहले दो चुप रहते तीसरा अपने मज़ाक पर खुद ही हँसता। दूसरा शुरू करता, "सच ! तुम ठीक कहते हो तुम नेपोलियन हो, तुम्हें कोई नहीं पहचानता ; देखो मुझे ही देखो मैं भी तो कैनेडी हूँ।"

तीसरा फिर शान्ति को भंग करता और कहता—"दोनों सुन रहे हो न ! यदि तुम नेपोलियन, कैनेडी हो तो मैं भी राठौर हूँ, देखो निकल रही है मेरी तल्वार म्यान से। और ये लो मेरा डायलाग—'निकल पड़ी तल्वार म्यान से अमर सिंह राठौर की, खैर नहीं है अब जालिम सिंह की जान की'।"

तीसरे के हाव भाव से दोनों खिलखिला पड़ते।

और फिर तीनों की हँसी आसमान को छू जाती।

शाम बीत जाती।

* * * *

"देखो ! देखो ! वह कैसे चल रहा है। उसे क्या कहेंगे"—एक दूसरे से पूछता।

"क्यों ! 'मेढ़क' कैसा रहेगा ?"—तीसरा तुरन्त उत्तर देता।

"हाँ ! हाँ ! बिलकुल ठीक है साले को, मेढ़क ही कहेंगे"—तीनों एक स्वर मे दोहराते।

और ऐसे कितने ही 'मेढ़क' उनके सामने से गुजरते या टकरा जाते, जिन पर वे हँसी के ठहाकों को खरीद लाते। हजार मेंढ़क दस हज़ार बार हँसी। तभी से उनकी हाजिरी रोजाना, उनके कच्चे चिट्ठों पर 'कामेन्ट्स', खानदान को नापना, नकलें करना, उपनाम देना और अन्य अन्य ऐसी ही बातें शुरू हो जातीं।

कभी ऐसा भी होता कि उनके मनों में अंधेरा छाजाता शाम के अंधेरे के साथ। तब वे तीनों चुप हो जाते। कल से नहीं मिलेंगे ऐसा सोचते, बेतुकी बातों के साथ उनके दिलों के अन्दर न जाने क्या टूट जाता। और जैसे सोच लेते अगली शामों अपनी तनहाई में घुटने के लिए। फिर भी वे हँसते, चूँकि रोज हँसते हैं। कोई उन्हें उदास न देखे। पर मौन छा जाता। बातों का क्रम रुकसा जाता। तभी एक बोलता—"नेपोलियन तुम भी चुप हो, कुछ तो बोलो।" दूसरा—"कैनेडी तुम्हीं

बोलो कुछ"। तीसरा—"अरे! तुम्हारी तलवार ही क्यों न बाहर निकाली जाय म्यान से क्यों राठौर! ठीक है न!"

पुराने मज़ाक की पुरानी हँसी उन्हें फिर पास ले आती। फिर भी स्वर काँपते।

"मै नेपोलियन नहीं हूँ"—पहला कहता निराशा में डूबते हुए।—"सचमुच मैं भी कैनेडी नहीं हूँ"—दूसरा समर्थन में कहता उसी उदासी के साथ।

तीसरा दोनो से तंग आकर उनसे जोर से पूछता—"तो क्या मैं राठौर हूँ? छोड़ो। देखो वे जा रहे 'मीर कासिम' "—और जोर से हँसता। खुद ही हँसकर रह जाता।

कैनेडी का लम्बा चौड़ा भाषण होता तीसरे की हँसी पर। कहता—"अरे यह सब स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखो राठौर! ये चिढ़ाना आज से बन्द, और न ही किसी को 'क्रिटीसाइज' करेंगे। किस में गुण-दोष नहीं। आदमी ही तो हैं हम सब। ऐसा ठीक नहीं, कल से मैं नहीं आऊँगा।"

तीसरा—"फिर वही," लेकिन विश्वास के साथ कहता—"अरे यार! चुप भी होता है कि नहीं, ये शास्त्र-पुराण रखो केवल अपने पास। चाहे तुम 'चीप' ही समझो लेकिन अगर जीना है दूसरो पर हँसों और इतना हँसो कि तुम पर कभी कोई हँस न सके। अपने पर रोने के लिए हमें खुद ज़रूरत नहीं, और बहुत हैं हम पर रोने के लिए। जियो और हँसकर जियो, चार दिन के बाद मैं कहाँ! तुम कहाँ! बोलो कल से नहीं आ रहे हो न? पर सुन लो, जो कहते हैं वे करते नहीं। बन्दे! दूसरों पर हँसना जितना आसान है, उतना अपने पर रोना नहीं।"

फिर वही उसका पुराना डायलाग, वही सबकी पुरानी हँसी। जीने की बात से कौन समझौता नहीं करता। अगली शाम फिर वहीं आ जाते हैं खुद-ब-खुद वे तीनों। वे तीन हँसते ही देखे जाते हैं। वह बात ज्यों की त्यों फैली रहती है।

*   *   *   *

वे तीन मिलकर रहते हैं और जी भर कर हँसते हैं। लोगों की नजरों में और कुछ नहीं इससे ज्यादा, कभी कभी उनकी हँसी उन्हें चुभ ज़रूर जाती है। हँसी के चुभने पर उनका मन खट्टा भी हो जाता है। पर कौन जानता है वे नेपोलियन आदि भी हैं और कभी नहीं भी। वे अँधेरे में खो जाते हैं जिसमें उन्हें एक दूसरे का हाथ

पकड़ पकड़ कर हँसने के लिये घसीटना पड़ता है किसी मशहुर शायर का शेर दिल में गुनगुनाते हुए—

"न मिट सकेगी तनहाइयाँ मगर ऐ दोस्त,
जो तुम भी हो तो तो तबीयत जरा बहल जाए।"

यदि समझ सको

सी० वी० कोण्डय्या

यदि समझ सको इस आँसू को,
यों मुझको दोष न दे पाती।
मैं हर डाली का पंछी हूँ,
कहीं नीड़ नहीं अपना कोई,
निरुद्देश्य निकला, भटका,
मैं पथ भूला एक राही हूँ।
यदि समझ सको इस राही को,
यों मुझको दोष न दे पाती।
हर सपना अधूरा बचता है,
हर लहर न तीर पहुँचती है,
हर घटना अनिश्चित घटती है,
हर भूल पर जीवन रोता है।
यदि समझ सको उन भूलों को,
यों मुझको दोष न दे पाती।
कहीं बिगड़ता हीं है बनता,
अनिश्चित जीवन है सबका,
जब कर न सका जो सोचा था,
तब कौन यहाँ दोषी ठहरा ?
यदि समझ सको री को,
यों मुझको दोष न दे पाती।
कर्तव्य बहुत हैं जीवन के,
मत बाँधों कोमल बाँहों से,
मैं हूँ तिनका उस सागर का,
जहाँ लहरें हैं, आँधी भी।
यदि समझ सको उस आँधी को,
यों मुझको दोष न दे पाती॥

ट्राफिक-लाइट

शेषगिरि राव एन०

यौवन सी दौड़ती है फोर्ड कार,
आँखमिचौनी खेलती है ट्राफिक-लाइट।
लालरंग,
सडन-ब्रेक।
"लाल रंग को मैं बहुत पसंद करती हूँ"।
स्वप्ना की हँसी में चाँदनी दौड़ती है।
"कोट-बाबू! यह बंबई नहीं···
फिर भी···आप कहाँ और हम कहाँ··· ?"
उलझन
चाँद बार-बार मेघों के पीछे भागता है।
"मेरे लिये क्या लाते हो ?
दुनिया!!! पागल!"
गुलाब के फूल फिर झरमाते हैं।

सामने हरा रंग,
एक घण्टे के बाद—
थके हुए हृदयों का मिलन।
यौवन सी दौड़ती है फोर्ड-कार,
धूल में
आँख मिचौनी खेलती है ट्राफिक-लाइट।

दो कविताएँ

द्विजराम यादव

(१)

क्लब और होटलों की चहल-पहल,
शहर की चीं-पों में टैक्सियों का सरकना
जब बन्द हो जाता है,
तब आकाश-मरूभूमि में,
विकराल रात्रि चाँद, तारों की
बारात लिए घहरा पड़ती है ।
और हम सोये-सोये—
किसी की यादों में खो जाते हैं ।
धीरे-धीरे रात घनीभूत पीड़ा लिए
रेंगने लगती है ;
आधी रात ; फिर सुबह ;
पर उसके पहले हम उठ कर देखते हैं—
प्रकृति-सुन्दरी के
अश्रु अभी पड़े हैं—
परन्तु सबके जगने से पहले
चुपके से आकर कोई
अपनी सुनहरी रूमाल से पोंछ जाता है ।
परन्तु उसके आँसू,
वणिक सभ्यता के कारण मैं पोंछ नहीं पाता ।
बीसवीं शताब्दी का सातवाँ दशक—
आवारा कुत्तों की तरह जूठन ले,
छीना-झपटी करता है ।

At Rest

H. N. Krishna Murthy

(२)

वृक्षों के लम्बे-लम्बे साये,
सरकते हुए काले पड़ जाते हैं ;
औ, मैं कुण्ठाओं का गट्ठर,
अपने दिमाग पर लादे
अचानक सजाग हो जाता हूँ ।
पास से संथाल बालाओं की टोली
'नरे नरे ना' करती हुई गुज़र जाती है ।

আমাদের শান্তিনিকেতন,
সে যে সব হ'তে আপন।

তা'র আকাশ-ভরা কোলে,
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন ॥

মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা ॥

মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন ॥

আমরা যেথায় মরি ঘুরে'
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তা'র সুরে ॥

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন ॥

SHE is our own, the darling of our hearts
our SANTINIKETAN !
Our dreams are rocked in her arms,
her face is a fresh wonder of love every time
we see her,
for she is our own, the darling of our hearts.
In the shadows of her trees we meet,
in the freedom of her open sky,
her mornings come and her evenings
bringing down heaven's kisses,
making us feel anew that she is our own,
the darling of our hearts.
The stillness of her shades is stirred
by the woodland whisper ;
her *amlaki* groves are aquiver with the rapture
of leaves,
She dwells in us, and around us, however far
we may wander ;
she weaves our heart in a song making us one in music
tuning our strings of love with her own fingers,
and we ever remember that she is our own,
the darling of our hearts.

Rabindranath Tagore